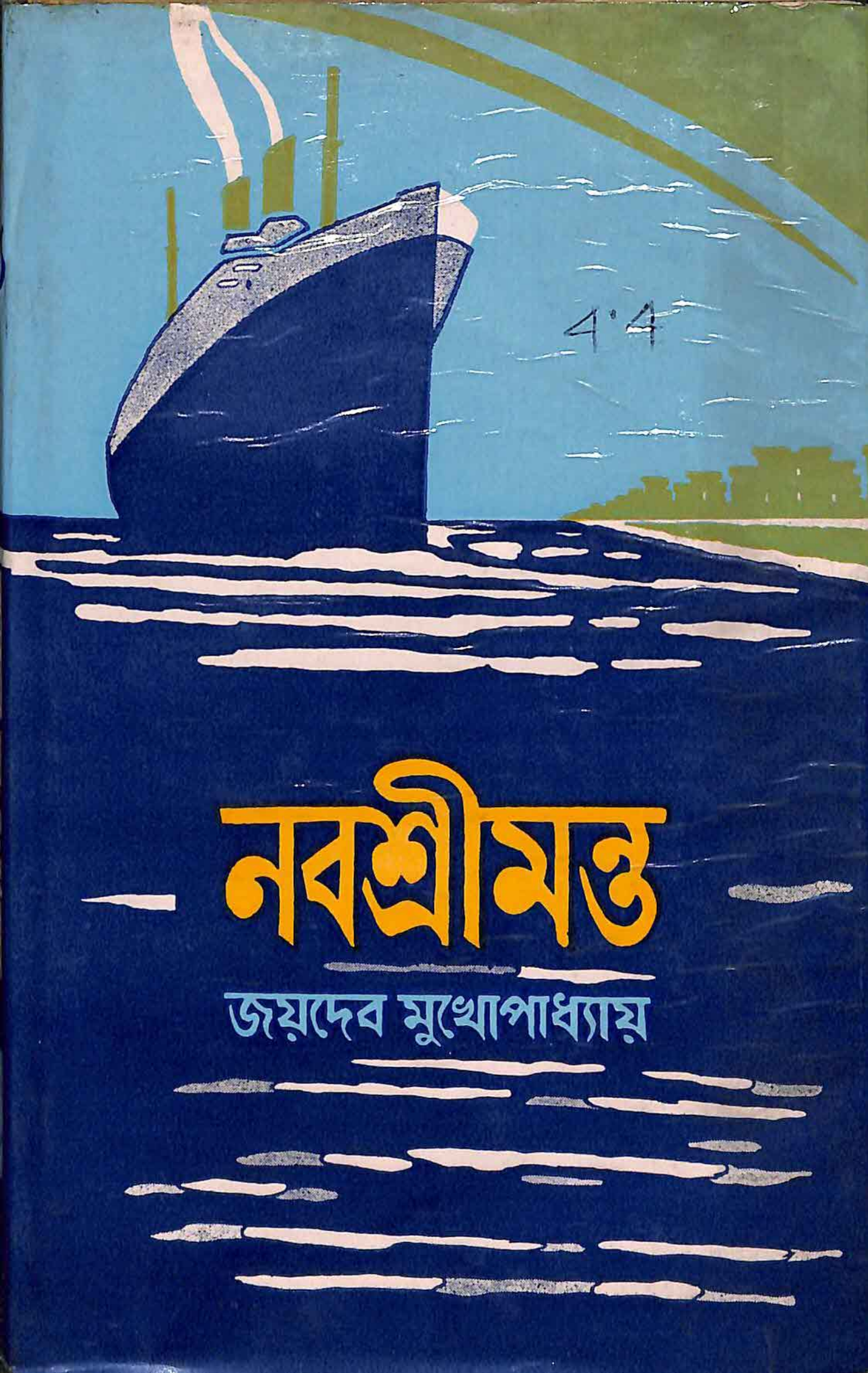

নবশ্রীমন্ত
জয়দেব মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হল

নব শ্রীমন্ত

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৭

প্রকাশক :
সুরেশ দাশ
লেকটাউন,
কলিকাতা-৮৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
মৃণাল রায়

মূল্য : বারো টাকা

মুদ্রাকর :
বাণীমালা প্রেস
ফাল্গুনী কুমার পাল
৫৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

—উৎসর্গ—

যুবক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে—

এই লেখকের অন্য বই :

কাঁহা গেলে তোমা পাই।

স্তম্ভিত ইতিহাস।

হায়! তুমি কোথায়।

অবতারণা

'নব-শ্রীমন্ত' গতবছর 'ঝাড়গ্রাম বার্তা পত্রিকা'র পূজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক শ্রীসুরেশ দাশ সেই লেখাটি পড়ে আগ্রহ সহকারে অভিমত চেয়ে পাঠালেন এটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য। সানন্দে তাঁর অভিপ্রায়কে মর্য্যাদা দিলাম এই ভেবে যে, এ রচনাটি হয়তো বর্তমান যুগের সংশয়ক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট অসংখ্য যুবক বন্ধুর সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারবে। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, সঙ্কল্পে যদি অবিচলিত থাকা যায় এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যদি অবিরাম সংগ্রাম ও সাধনা করা যায় তবে বিরাট সাফল্য যে আসতে পারে, সেই সত্যের বাস্তব চিত্রটিকে আগামী দিনের জীবন-যোদ্ধাদের সামনে হাজির করাই হচ্ছে এ রচনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ক্ষুদ্রাবয়ব এ গ্রন্থের কাহিনী একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন ইতিহাস-ভিত্তিক। এই কাহিনীর নায়ক মাতঙ্গ হালদার আসলে ছদ্মনাম। কারণ শ্রীহালদার এখনও জীবিত। ৭৫ বছর বয়সে আজও তিনি আত্মপ্রচারে বিমুখ, প্রকাশভীরু। তাই তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁর ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হলো। তবে তাঁকে অর্থাৎ মাতঙ্গকে প্রয়াত প্রসিদ্ধদের অনেকেই স্নেহ করতেন। জীবিতদের মধ্যে এখনও এমন বহুজন আছেন, যাঁরা এই মাতঙ্গ হালদারের গুণাবলীর পঞ্চমুখে প্রশংসা করে থাকেন। ডঃ রমা চৌধুরী, অমিয় মুখার্জী, বিভূতিভূষণ ঘোষকে (চেয়ারম্যান "আজকাল পত্রিকা") জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে এই মাতঙ্গ হালদারের আশ্চর্য জীবন কথা। সৌম্যেন ঠাকুর, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর ও নেতাজী নন্দিনী অনীতা, সাগ্রহে অতিথি হয়েছেন এই মাতঙ্গ

হালদারের আবাসে তাঁর এবং তাঁর বিদুষী মমতাময়ী পত্নীর আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হয়ে।

নগণ্য এই পুস্তকটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে লেখককে অনুগৃহিত করেছেন ভোলানাথ প্রকাশনীর অধ্যক্ষ ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীসুরেশ দাস। এঁদের সহৃদয়তার কাছে ঋণাবদ্ধ রইলাম।

মহান এই দেশের যৌবন জল-তরঙ্গ, সংসার সমরাঙ্গনে, আরও বেশি কল্লোলিত হোক, হোক নবাদর্শে উদ্দীপিত—ক্ষুদ্র এই গ্রন্থটির কেবল এইটুকুই প্রার্থনা।

বিনয়াবনত

১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৭

জয়দেব মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

নৈরঞ্জনার তীরে উরুবিল্ব বনে যে বিরাট মহীরুহের নীচে আসন গ্রহণ করে শাক্য সিংহ একদিন সহুঙ্কারে শপথ নিয়েছিলেন সন্ধ্যার গগন পবন মন্দ্রিত করে—

'মেরুঃ পর্ব্বতরাজ স্থানতু চলেৎ সর্ব্বং জগন্ন ভবেৎ
সর্ব্বে তারকসঙ্ঘ ভূমি প্রপতেৎ সজ্যোতিষেন্দ্রা নভবৎ।
সর্ব্বে সত্ত্ব কবেয় একমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো
নত্বেব দ্রুমরাজ মূলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ ॥

(যদি পর্ব্বতরাজ মেরু স্থানচ্যুত হয়, সর্ব্বজগৎ শূন্যে মিশে যায়, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহরাজি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে আকাশ থেকে ভূমিতে হয় পতিত, বিশ্বের সমস্ত প্রাণী যদি একমত হয়, এমন কি মহাসমুদ্রও যদি বা শুকিয়ে যায়, তবু আমাকে এই বৃক্ষমূল থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না কেউ।) সেই মহাবোধি দ্রুমের বীজটা কি কেউ দেখেছিল কখনো ? ছোট্ট একটা গোল মরিচের দানার চেয়ে বড় সেই বীজ ছিল না নিশ্চয়। ঐটুকু বীজের ছিল এত প্রাণশক্তি ! শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, সহস্র ঝুরির জটা ছড়িয়ে সে আজ এক দৈত্যাকৃতি ঋষি যেন। এমন কথা হঠাৎ মনে হচ্ছে আজ—কারণ, আমাদের চোখের সামনেও যে এই মুহূর্ত্তে আমরা একটি অতি ক্ষুদ্রাবয়ব বীজকেই দেখতে পাচ্ছি।

চেৎলার আদি গঙ্গার তীরে বসে, মহেশতলা স্কুলের মাষ্টার মশায়ের বলা কথাগুলি উজ্জল দুই চোখ মেলে শুনছে সে, শুনছে বললে বোধ হয় কম বলা হবে। যেন গোগ্রাসে গিল্‌ছে। কতই বা বয়েস, খুব জোর আট। ক্লাস সিক্সের পড়ুয়া। কিন্তু তেষ্টার যেন আর অন্ত নেই। সবকিছু সম্পর্কে জানার তেষ্টা। হা-হা করছে সব সময়। ঐ বোধিবৃক্ষের বীজটির মধ্যেও কি আড়াই হাজার বছর আগে একদিন এমনই হা-হা রবে তেষ্টা জেগে উঠতো ? গগনচুম্বী হওয়ার মন্ত্র জানার দুরন্ত ব্যাকুলতায় ?

'আদি গঙ্গা মানে কি মাষ্টার মশাই !' ক্লাস সিক্সের বিদ্যা নিয়ে যুবক শিক্ষক অবিনাশ বাবুকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পাগল করে দেবার জো করলো—বেহালার শিবরামপুর গ্রামের হালদার বাড়ীর সবচেয়ে ছোট ছেলেটি, যাকে আমরা বীজ বলেছি একটু আগে।

অবিনাশ বাবু কিন্তু চাষীর কাজে খুবই উৎসাহী। ভাল বীজের সন্ধান পেলে তাকে সযত্নে লালন-পালন করাটা তাঁর অনেকটা নেশার মত। তিনি সস্নেহে উত্তর দিলেন—'বাংলা-দেশে ঢাকার মুখে গঙ্গার একটি ধারা 'পদ্মা' নাম নিয়ে পূর্ব্ববঙ্গের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। আর গঙ্গার মূল ধারাটি মুর্শিদাবাদের মধ্যে দিয়ে বর্ধমান, হুগলী আর নদীয়ার সীমা চিহ্নিত করে চব্বিশপরগণায় প্রবেশের পর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম আর কালীঘাটের মন্দিরের পশ্চিম পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই গঙ্গা রসা, বৈষ্ণবঘাটা (গড়িয়া), রাজপুর, আটিসারা (বারুইপুর), দক্ষিণ বারাসত, জয়নগর, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, সাতঘরা, ছত্রভোগ, বড়াসী, খাড়ি—এইসব গ্রাম অতিক্রম করে সাগর দ্বীপের ওপর দিয়ে বঙ্গোপ-

সাগরে পড়েছে। এটাই হল আসল গঙ্গা। তাই এর নাম আদি গঙ্গা।'

সহজে বিশ্বাস করার ছেলেই নয় মাতঙ্গ হালদার। বাচ্চা হলে কি হয়, সাচ্চা যুক্তি দিয়ে যতক্ষণ না বোঝানো হচ্ছে ওকে, মান্‌বে না কিছুতেই। সে আবার প্রশ্ন করে বলল—'এটাই যে আদি গঙ্গা আপনি জানলেন কেমন করে।'

'কৃত্তিবাসের' রামায়ণ পড়ে। কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্যে ভগীরথ গঙ্গার পবিত্র বারিধারাকে এনেছিলেন সাগর দ্বীপেই। এই গঙ্গা যে বয়ে গেছে সেই সাগর দ্বীপেরই ওপর দিয়ে। সারা ভারতের লোক তাই পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর তীর্থ করতে আসে এই সাগর দ্বীপে, তারা কেউ যায় না পদ্মা সাগর-সঙ্গমে।

'কিন্তু, এই আদি গঙ্গায় তো জলই নেই মাষ্টার মশাই।'

'কেমন করে থাকবে? নবাব আলিবর্দি যে আদি গঙ্গার সব জল কেড়ে নিলেন। নৌ-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দক্ষিণে একটা খাল কেটে, সরস্বতী নদীর মজা খালে হুগলী নদীর (ভাগীরথী) জলধারা বইয়ে দেন আলিবর্দ্দি। কালক্রমে সেই ধারা প্রবল হয়ে উঠল দামোদর, রূপনারায়ণ আর হলদির জল পেয়ে।

এর ওপর আবার ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল টলি এই আদি গঙ্গার খালের খানিকটা কেটে পূর্বদিকে বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন—যেটাকে এখন সবাই বলে টালি নালা। প্রধানতঃ এই দুটি কারণেই দ্রুত মজে গেল এই আদি গঙ্গা। তবে একটা খালের আকারে সেই আদি গঙ্গা দীর্ঘদিন বর্তমান ছিল। সেই খালের স্রোতে ডিঙি ভাসিয়েই ভবানীপুর থেকে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পৈত্রিক গ্রামে যেতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা আত্মকথায় আছে এর উল্লেখ (১৮৬৪)। আজকে যে সুভাষ বসুর এত নাম-ডাক, সেই সুভাষেরই পূর্ব্বপুরুষ পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) ছিলেন গৌড়ের নবাব হুশেন

শাহের এক মন্ত্রী। তিনিও এই আদি গঙ্গার উজান পথেই গৌড়ে যেতেন।

'সুভাষ বসু? যে সুভাষের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন আপনি আমাকে? যাঁকে জেলে যেতে হয়েছে অনেক বার?'

'হ্যাঁ মাতঙ্গ। আবার এই বাংলার সুপ্রসিদ্ধ বণিকরাও যে এই আদি গঙ্গার পথেই সমুদ্রযাত্রা করতেন সকলে, তারও প্রমাণ পাচ্ছি আমরা প্রাচীন লোক-সাহিত্যগুলোতে।'

'সমুদ্রযাত্রা কেন করতেন বণিকরা?'

'বাণিজ্যের জন্যে।'

'বাণিজ্য কি মাষ্টার মশাই?'

'বিদেশে গিয়ে ব্যবসা করে টাকা আয় করাকে বলে বাণিজ্য।'

'বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করলে অনেক টাকা পাওয়া যায় বুঝি?'

'তাতো পাওয়াই যায়! কিন্তু তার জন্যে চাই অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুর্জয় সাহস আর অসীম ধৈর্য্য।'

হঠাৎ দুই চোখ চক্‌চক্ করে উঠল বালকের। উৎসাহদীপ্ত মুখে আবার সে শুধালো—'যে সব বণিকরা এই আদি গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে সমুদ্রযাত্রা করতেন, তাঁরা বাণিজ্য করে অনেক টাকা পয়সা আয় করতে পেরেছিলেন?'

'তা আবার পারেন নি? বাণিজ্য করে তাঁদের কেউ কেউ ধনকুবের হয়ে উঠেছিলেন। চাঁদ সওদাগরের নাম শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ! লখিন্দরের বাবা তো?'

'সেই চাঁদ সওদাগর কালীঘাটে পূজো দিয়ে, এই আদি গঙ্গায় বাণিজ্যপোত ভাসিয়ে—প্রথমে আটিসারায় (এখনকার বারুইপুর) যান। তারপর দক্ষিণবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছত্রভোগে উপস্থিত হন। ধপধপির কাছে যে চাঁদখালি গ্রাম আছে, সেটি চাঁদ সওদাগরের স্মৃতিকেই বহন করছে আজও। এ সব লেখা আছে—পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা-মঙ্গলে।' 'আর

শ্রীমন্ত ? যার গল্প মার কাছে শুনেছি কতবার ? সে কোথা দিয়ে যেতো বাণিজ্য করতে মাষ্টার মশাই ?' 'ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডী-মঙ্গলে শ্রীমন্তের কাহিনী পাবে। শ্রীমন্ত সওদাগর তাঁর ডিঙা নিয়ে কালীঘাট থেকে বৈষ্ণবঘাটা (আজকের গড়িয়া), মাহিনগর, বারাসত পার হয়ে ছত্রভোগে পৌঁছতেন এই আদি গঙ্গারই পথ ধরে।'

অবিনাশ এই পর্য্যন্ত বলে সবে থেমেছেন, আট বছরের কিশোর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, ছুটে নেমে গেল একেবারে আদি গঙ্গার ধারা অবধি। তারপর, এক আঁচলা গঙ্গা জল তার কচি দুই হাতের চেটোতে তুলে এনে—ওপরে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'আদি গঙ্গার এই পবিত্র জল নিয়ে আমি আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি মাষ্টার মশাই, আমিও বিদেশে যাবো, বাণিজ্য করবো ঐ চাঁদ সওদাগর আর শ্রীমন্ত সওদাগরের মত। আমার বাবা-মার বড় কষ্ট, তাঁদের বড় অভাব। বিদেশ থেকে টাকা এনে, সব টাকা তুলে দেবো আমি তাঁদের হাতে। বাবা-মার মুখে হাসি ফুটবে। আমায় সকলে ডাকবে —মাতঙ্গ সওদাগর বলে।'

আশার আলোর ঝিলিক দেখা দিল একবার পাকা চাষী অবিনাশের চোখে। বীজের বুক চিরে অঙ্কুর দেখা দিচ্ছে যেন! যুবক শিক্ষকের দৃষ্টিতে আজই প্রথম হঠাৎ ছায়াপাত ঘটল যেন অনাগতকালের আকাশ-ছোঁয়া এক বিশাল মহীরুহের।

ছেলেটার আবদারকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে, ওকে নিয়ে কালীঘাট দর্শনে এসেছিলেন অবিনাশ—শনিবারের বিকালে। দর্শন শেষে, চেতলায়, আদি গঙ্গার তীরে বসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে। আর, সেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঙ্গিত পেয়ে গেলেন বুঝি পিতামাতার অর্থাভাবে কাতর এক ক্ষুদ্র অশক্ত বীজের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের।

॥ দুই ॥

গভীর রাত্রে, পাশে শুয়ে থাকা পুত্রের দিকে নজর পড়তেই একটু বিস্মিত হলেন প্রাণদাময়ী। অন্য দিন রাত আটটা না বাজতে যে ছেলেটা ঘুমে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তার চোখে ঘুম নেই আজ এত রাত পর্যন্ত! কেবল এপাশ ওপাশ করছে, নয়তো হাত-মাথা চুলকোচ্ছে।

সস্নেহে চুলের মধ্যে দিয়ে নিজের আঙ্গুলগুলো চালিয়ে দিয়ে—কপালে একটা চুমু দিয়ে শুধালেন তিনি,—'ঘুমোচ্ছ না কেন মাতু, পেট ভরে খাওনি বুঝি আজ? খিদে পাচ্ছে বুঝি?'

জননীর প্রশ্নে চোখ মেলে তাকিয়ে, চকিতে জড়িয়ে ধরলো তাঁর গলাটা। তারপর বলল অনুচ্চ স্বরে মাতঙ্গ—'তুমি আর ভেবে ভেবে অমন রোগা হয়ে যেও না, মা। আজ আদি গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে, আদি গঙ্গার জল হাতে নিয়ে মাষ্টারমশাই-এর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছি—সওদাগর আমি হবোই।'

'সে কিরে? সওদাগর হবি মানে?'

'চাঁদ সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগরের মত আমিও এক মস্ত সওদাগর হবো। বিদেশ যাবো, বাণিজ্য করবো—তারপর হাজার হাজার টাকা এনে তোমার হাতে তুলে দেবো।'

'এই চিন্তা মাথায় ঢুকেছে বুঝি? আর তাই ছট্‌ফট্ করছিস্ শোয়ার পর থেকেই, ঘুমের নামগন্ধ নেই?'

'বাঃ, কেমন করে ঘুম আসবে? তুমি যে বলেছিলে—সপ্তডিঙায় করে শ্রীমন্ত গিয়েছিল এখান থেকে। সেই সপ্তডিঙা কোথায় পাওয়া যায়—সেটাই যে জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গিয়েছি মাষ্টার মশাইকে।'

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতেই, একটু হেসে বললেন প্রাণদাময়ী 'তার জন্যে না ঘুমিয়ে এত চিন্তা করছিস্? সোমবার যখন স্কুলে যাবি, তখনই তো জেনে নিতে পারবি এ কথা মাষ্টারের কাছ থেকে। তা, সওদাগর হবার বুদ্ধিটা দিলো কে রে? মাষ্টার বুঝি?'

'না মা। আজই এ বুদ্ধিটা আমার মাথায় এসে গেল। জানো মা—চাঁদ সওদাগর, শ্রীমন্ত—ওরা সবাই ঐ আদি-গঙ্গাতেই নৌকো ভাসিয়ে দূর দূর দেশে যেতো বাণিজ্য করতে। ফিরে আসতো বস্তাভর্ত্তি টাকা নিয়ে। মাষ্টার মশাই বলেছেন—ওরা নাকি ধন-কুবের হয়েছিল।' 'তোরও বুঝি খুব বড়লোক হতে ইচ্ছে করে? লাখ লাখ টাকার মালিক হতে?'

'সেকি? আমি টাকার মালিক হয়ে কি করবো। টাকা তো আয় করে আনবো তোমার আর বাবার জন্যে। তুমি সেদিন বল্‌ছিলে না—ব্যবসা করতে গিয়ে দারুণ লোকসান হয়েছে এবার বাবার! চিন্তায় ভাবনায় তুমি আর বাবা রোগা হয়ে যাচ্ছ—সবাই বলছে। তাই তো আমি বাণিজ্য করবো ঠিক করেছি।'

দুই বাহুতে সজোরে পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন প্রাণদাময়ী। নয়নাশ্রুতে ভেসে গেল তাঁর বুক।

এক সপ্তগ্রামের হতদরিদ্র কুটীরে, নিশীথের মধ্যযামে, যখন বাবা-ভাই-বোন সব গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন তাঁর কনিষ্ঠতম পুত্রটি শুয়ে ছটফট করছে—দরিদ্র পিতামাতার আর্থিক দুর্দ্দশার কথা ভেবে। কাটাচ্ছে বিনিদ্র রাত্রি। মাত্র আট বছরের শিশুমন নিয়ে সে অভয় দিচ্ছে জননীকে। একদিন সে সওদাগর হয়ে ঘুচোবেই সব দুঃখ বাবা-মায়ের!

পুত্রের সর্বাঙ্গে নীরবে হাত বুলোতে বুলোতে মনে মনে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানালেন প্রাণদাময়ী—'ঠাকুর, এই সরল শিশুর কোমল প্রাণের আকুল ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করো তুমি।'

সকালে নিদ্রাবেশ নিয়ে, ঘরের বাইরে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতেই বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না শিবনাথের। মাতঙ্গ একা দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই প্রতীক্ষায়। আজ তো মর্ণিং স্কুল হবার কথা নয়, আজ যে রবিবার! তবু, ভোর পাঁচটায় ছেলেটা ছুটে এসেছে কেন তাঁর কাছে!

একটু এগিয়ে গিয়ে, পুত্রের কাঁধে হাত রেখে শুধোলেন, 'কি ছোটবাবু, এত ভোরে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?'

'তোমার কাছে একটু দরকার আছে। আচ্ছা বাবা, সপ্তডিঙা কোথায় পাওয়া যায়?' 'সপ্তডিঙা?' আকাশ থেকে পড়লেন যেন শিবনাথ। সাত সকালে, এইটুকু ছেলের মুখে এমন অদ্ভুত প্রশ্নের কি যে উত্তর দেবেন—হঠাৎ ভেবেই পেলেন না তিনি। 'হ্যাঁ, বাবা, সপ্তডিঙা। সেই যে—যে সপ্তডিঙাতে চড়ে শ্রীমন্ত গিয়েছিল বাণিজ্য করতে?'

শিবনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—'হঠাৎ সপ্তডিঙার খোঁজ করছো কেন, ছোটবাবু, তা তো বললে না!'

'আমি বাণিজ্যে যাবো যে!' অবোধ পিতাকে বুঝোবার চেষ্টা করলো মাতঙ্গ। 'তাই নাকি? বাণিজ্যে যাবে? তা—কবে যাওয়া ঠিক করেছো? 'সপ্তডিঙা পেলেই যাত্রা করবো। বলো না বাবা, সপ্তডিঙা পাওয়া যায় কোথায়?' 'বলছি, বলছি বাবা। কিন্তু, তার আগে তুমি আমার আর একটা কথার জবাব দাও তো!'

'কি কথা?'

'হঠাৎ বাণিজ্যে যাবার ইচ্ছেটা তোমার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল কেন ছোটবাবু?'

'বারে! বাণিজ্যে না গেলে হাজার হাজার টাকা আয় করবো কেমন করে? চাঁদ সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগর বাণিজ্য করতো বলেই না ধনকুবের হতে পেরেছিল—মাষ্টার মশাই বলেছেন?' 'কিন্তু এত টাকার দরকার তোমার হঠাৎ পড়লো কেন তা তো বুঝতে পারছি না!'

'আমার আবার কিসের দরকার। আমি তো বাণিজ্য করে পাওয়া সব টাকা-পয়সা এনে তুলে দেবো তোমার আর মার হাতে।'

'আমার আর তোমার মার হাতে? কিন্তু, কেন?'

দুই হাত দিয়ে পিতার কোমর জড়িয়ে ধরে—সমবেদনায় ছলছল দুটি আঁখি তুলে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মাতঙ্গ বলল—'তোমার ব্যবসাতে খুব লোকসান হয়েছে। টাকার তোমার খুব অভাব। দুশ্চিন্তায় তুমি আর মা রোগা হয়ে যাচ্ছ—সবাই বলছে। তাই আমি ঠিক করেছি...........'

পুত্রের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলেন পিতা—'তুমি বাণিজ্যে যাবে এই তো। আমাদের দুঃখে তোমার ঐ ছোট্ট কচি বুকখানাতে অনেক ব্যথা জমে উঠেছে, না বাবা?' বলতে বলতে—শিবনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো অশ্রুবাষ্পে। দারিদ্র্য আর অনটনে বিধ্বস্ত সংসারের ওপর অকস্মাৎ নেমে এসেছে কাপড়ের ব্যবসায়ে বিরাট এক লোকসানের ধ্বস্। সত্যিই চিন্তায় রাতে আর ঘুম আসতে চায় না শিবনাথের। কিন্তু তাঁর এই দুর্দ্দৈব এবং দুর্দ্দশার খবর যে বাড়ীর সবচেয়ে ছোট ছেলেটার কানেও পৌছেচে—এটা জানা ছিল না তাঁর। আশপাশে এত আত্মীয় আছে—তাদের কেউ তো এগিয়ে আসছে না একবারও এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে! অথচ এই দুধের শিশু রাত না পোহাতে ছুটে এসেছে তাঁর অভাব ঘুচোবার আকুল আগ্রহে—সপ্তডিঙার সন্ধানে, তাঁরই কাছে। অধীর ব্যগ্রতায় পুনশ্চ প্রশ্ন করলো মাতঙ্গ—'কই বাবা, বললে না! সপ্তডিঙা কোথায় গেলে পাবো?'

ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে শিবনাথ ধরা গলাতেই উত্তর দিলেন—'সপ্তডিঙা' কিনতে যে অনেক টাকা লাগবে, বাবা। এখন থেকে কিছু কিছু পয়সা জমাতে শুরু করো। বেশ কিছু যখন জমে উঠবে, আমাকে দিও, আমি সপ্তডিঙা কিনে এনে দেবো।'

'দেবে তো?' উৎসাহে ফেটে পড়লো এবার বালকের কণ্ঠস্বর, 'ঠিক দেবে তো কিনে? আজ থেকেই তবে আমি পয়সা জমাতে আরম্ভ করছি বাবা!'

'কিন্তু পয়সা কোথায় পাবে?'

'তুমি যে ইস্কুলের টিফিনের জন্যে দুটো করে পয়সা দাও, তাই জমাবো আমি রোজ!'

'না খেয়ে পয়সা জমাবে?'

'বারে! সপ্তডিঙা কিনতে হবে না বুঝি?'

॥ তিন ॥

মহেশতলার শীতলাদেবীর মন্দিরে সেদিন ছিল বাৎসরিক পূজো। গ্রামগঞ্জের লোকের ভীড় জমে উঠেছিল। বেলা আটটা বাজতে না বাজতেই চারিদিকের চত্বরে ছোটখাটো মেলাও বসে গিয়েছিল আগের দিন থেকেই। কুলপী বরফ, পাঁপর-ভাজা, তিলের নাড়ু, গ্যাস-বেলুন, নানা রং-এর কাগজের ফুল, কাঁচের চুড়ি আর মাটির পুতুল ছিল ছোট ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। মন্দিরের অদূরে, একটি দোকানের মধ্যে কাঠের নড়বড়ে বেঞ্চির ওপর বসে এক গৈরিকধারীর সঙ্গে প্রায় ফিস্‌ফিস করেই কথা বল্‌ছিলেন স্বাস্থ্যবান যুবক অবিনাশ মাষ্টার।

'পরশু বেরিয়েছো জেল থেকে, এরই মধ্যে আবার স্বদেশী শুরু করে দিলে নরেন কাকা? পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ছ-ছবার জেল ঘোরা তো হয়ে গেল' এখন একটু বিশ্রাম নিলেই তো পারো!'

নরেন বৈরাগীর চোখ দুটো একবার দপ্‌ করে উঠল—মনে হ'ল! 'বিশ্রাম? ক্রীতদাসের আবার বিশ্রাম বলে কিছু থাকে নাকি? আমার লেখা শেষ গানটা শুনিস্‌-নি বুঝি?'

'কোন্‌ গানটা কাকা?'

'সেই যে রে—কদমে কদমে হও রক্ততে সিক্ত হে হর্দম?'

'কই, না তো? এ গান আবার কবে বাঁধলে তুমি? গাও না

একবার শুনি! কতদিন তোমার ভরাট গলার দরাজ গান শুনি নি!'

'শুনবি? দাঁড়া, আগে বুগবুগিটা বের করে নি ঝুলির ভেতর থেকে।' এই বলে, কাঁধে ঝোলানো গেরুয়া কাপড়ের ঝোলাটা থেকে বুগবুগিটা বের করে এনে, মুহূর্তের মধ্যে গান ধরলেন বৈরাগী—

কদমে কদমে হও রক্ততে সিক্ত হে দুর্দ্দম
দয়া আর মায়াটারে পদতলে করো দলে কর্দম।
ক্ষুধার্ত রুদ্রের ক্ষিপ্ততা সনে তোর সন্ধি,
বিঘ্ন যে পথে তোর—তুই হবি তার চির-দ্বন্দ্বী,
ছিঁড়ে দেরে অতীতের এঁটে আসা অজস্র ফন্দী,
সুপ্তির বুক চিরে মুক্তিরে টেনে আন্ দুর্দ্দম!
দয়া আর মায়াটারে পদতলে করো দলে কর্দম।

গান তো নয় যেন অগ্নিবান। শুন্‌তে শুন্‌তে সারা দেহে বার বার কাঁটা দিয়ে উঠতে চাইল মাষ্টারের।

গান শুন্‌তে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিল দোকানের সামনে। দোকানী বলে উঠল—'আর ভীড় কোরো না গো, এবার সব যাও, আর গান হবে না। লোকে ঘিরে থাকলে, দোকানের বেচা-কেনার ক্ষতি হয় যে!' দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি হেসে বৈরাগী কথা বললেন—'আমরা সব ক্রীতদাস। শ্লেভস্। শ্লেভস্ হ্যাভ নো এনজয়মেন্ট, নো রেষ্ট।' কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে নরেনের দিকে তাকিয়ে থেকে মাষ্টার বল্‌লেন—'একটা ছেলে আমার খুব নজর কাড়ছে বৈরেগী কাকা। শিবরামপুরের হালদার বাড়ীর ঐ ছোট ছেলেটা।'

'কে, মাতঙ্গ তো?'

'তুমি চেনো নাকি ওকে?'

'আরে ওর সঙ্গে যে আমার প্রায়ই দেখা হয়—যখন এ-অঞ্চলে থাকি। খাসা গলা গানের। আমার গলার অনেকগুলো গানই তো ও তুলে নিয়েছে—একবার মাত্র শুনেই। 'ছেলেটা প্রতিভাবান,

সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সাদা কশাইদের দেশছাড়া না করতে পারলে, এই অভাগা দেশে প্রতিভার মূল্য কি কেউ পাবে?' বলে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন বৈরাগী।

'পড়াশোনায় মন নেই একেবারেই। খেলাধূলোর দিকেই বেশি ঝোঁক আছে বলে যেন মনে হয়। গুল্‌তি ছোঁড়ায় ওর হাতের টিপ যদি একবার ছ্যাখো, অবাক হয়ে যাবে। অব্যর্থ ওর লক্ষ্য।'

'তাই নাকি? তবে তো ছেলেটা আমাদের কাজে লাগবে রে! তোর বাপের তো একটা দো-নলা বন্দুক আছে। সে তো মাঝে মাঝেই দৌড়য় স্থন্দরবনের দিকে শিকারের খোঁজে। ঐ মাতঙ্গকে দুই-একবার সঙ্গে পাঠালেই তো পারিস্। দেখবি, দুইদিনে বন্দুক ছোঁড়ায় ওস্তাদ হয়ে উঠবে, ও। ওর ঐ অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রতিভাটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে।'

'কিন্তু, কাকা, ও যে একেবারে বাচ্চা!'

'দূর বোকা, বাঁশ কাঁচা থাক্‌তেই কাজে লাগাতে হয়!'

'তার ওপর, এখন আবার একটা ভয়ঙ্কর ঝোঁক এসেছে মনে—বাণিজ্যে যাবার।'

'সে আবার কি?'

'বাণিজ্যে গো? বাবা-মার অর্থকষ্ট ঘুচোবে ও বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করে। ও নাকি চাঁদ সওদাগর আর শ্রীমন্ত সওদাগরের মত হবে।'

'তাই নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ—' বৈরাগীর উচ্চ হাস্যরোলে কেঁপে কেঁপে উঠল দর্মা দিয়ে বাঁধা ছোট দোকান ঘরটা। তারপর, হঠাৎ হাসি থামিয়ে আবার বললেন, 'তাহলে ভেবে ছ্যাখ একবার। একি সাধারণ দশটা ছেলের মত? দুধের গন্ধ এখনও লেগে আছে যে-ছেলের মুখে, সে বাণিজ্যে যেতে চাচ্ছে কেবল বাবা-মার দুঃখ লাঘব করতে। কোথাও কখনো শুনেছিস এমন কথা?'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকলেন দুজনেই। পরে মাষ্টার বললেন,

'তুমি ঠিকই বলেছ কাকা। এ ছেলের মধ্যে যে-বীজের সন্ধান আমি পেয়েছি, তা যে সাধারণ বীজ নয়, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি অনেক আগেই। কিন্তু, এমন সু-কোমল মনের ছেলেকে বাবার সঙ্গে শিকারে পাঠাতে আমার মনে দ্বিধা আসছে কেমন যেন।' আবার নয়নকোণে স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল নরেনের। 'অভিমন্যুকে কচি বয়েস থেকে লড়াই শিখিয়েছিল অর্জুন বলেই না—সেই ছেলে ব্যূহের পর ব্যূহ ভেদ করে তছনছ করতে পেরেছিল কৌরব সৈন্যদের—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে! সাদা চামড়ার ঐ দুঃশাসনের দলকে যদি তাড়াতে চাস এই পুণ্যভূমি থেকে, যত পারিস অভিমন্যু তৈরি করে যা।'—এই বলে, মুহূর্তের জন্যে নীরব হলেন তিনি। 'তারপর, খপ্ করে মাষ্টারের হাত দুইখানা নিজের বুগবুগি শুদ্ধ হাতের মধ্যে চেপে ধরে মিনতির সুরে বলে উঠলেন—'বল্, অবিনাশ, কথা দে, মাতঙ্গকে পাঠাবি তোর বাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে—শিকারে? তুই নিজেও না হয় যাস বাপের সঙ্গে। তোর সঙ্গে যাচ্ছে শুনলে—শিবু হালদার কোন আপত্তিই তুলবে না কখনো।'

এই সময় দেখা গেল—মেলার ভিড়ের মধ্যে জননীর হাত ধরে, অন্য কতিপয় মাঝ-বয়েসী গৃহস্থ বধূর সঙ্গে, মাতঙ্গ আসছে—কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে চাইতে। আর, ঠিক তার পেছনেই—মাথায় গেরুয়া পাগড়ী পরিহিত আপাদস্কন্ধ গেরুয়া পাঞ্জাবী-ধুতিমণ্ডিত, অনেকটা শিখ-এর মত দেখতে একটি লোকও নজরে পড়ছে সকলের।

মাষ্টার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মুহূর্তে। ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন—'দেখতে পাচ্ছ, কাকা?'

একগাল হাসি নিয়ে বেশ জোরে জোরে ঘাড় নাড়লেন বৈরাগী—'তুই তো মাতঙ্গকে কেবল দেখছিস, আমি দেখছি ওর পেছনের ঐ সর্দ্দারজীকে। নাম করা জ্যোতিষী। ওর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যে হয় না। কিন্তু, সর্দ্দার মাতঙ্গের দিকে অমনভাবে তাকাচ্ছে কেন বারবার, তা তো বুঝছি না।'

বলতে বলতে প্রাণদাময়ী সদলে এসে পড়লেন দোকানের একেবারে সামনে। মাষ্টারের দিকে দৃষ্টি পড়তেই, দৌড়ে দোকানে এসে ঢুকলো মাতঙ্গ মায়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে। নরেন বৈরাগী তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে প্রাণদাময়ীর দিকে চেয়ে বললেন—'কি গো মা জননী, এ-ছেলেকে চিনতে পারছেন ?

সশ্রদ্ধ স্বরে প্রাণদাময়ী বললেন—'তা আর চিনি নি ! আপনার গাওয়া কত গান যে আমরা শুনতে পাই ঐ মাতুর মুখে।'

'আপনার এই পুত্রটির গানের গলা কিন্তু ভারী ভাল, মা। দেখবেন, বড় হয়ে ও একজন নামকরা গাইয়ে হবে।'

'আরে, নরেন ভাইয়া, তুমি এখানে !' বলতে বলতে দোকানে প্রবেশ করলেন সেই গেরুয়া পাগড়ীধারী শিখ, একটু আগে যাঁকে দেখে বৈরাগী বলেছিলেন—'ও এক মস্ত জ্যোতিষী। ওর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যে হয় না।'

বৈরাগী দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত পাঞ্জাবী বন্ধুটিকে স-উল্লাসে একেবারে জাপ্টে ধরলেন। তারপর তাঁর পরিচয় দিলেন সকলের কাছে—এঁর নাম গুর্ণাম সিং। নাম-জাদা গণক। তবে সহজে ধরা দেন না কারুর কাছে।

প্রাণদা শিখের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—'তাই নাকি ? দেখুন তো বাবা, আমার এই ছেলেটার হাত। কি আছে এর কপালে ? পড়া-শোনায় মন নেই একেবারে, দারুণ চঞ্চল—'

'আপনাকে বলতে হবে না, মাজী ! আপনি না বললেও আমি নিজেই ওর হাত পরীক্ষা করতাম একবার। মেলায় ঢুকেই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনার ছেলের কপালের গড়নটা দেখে। তাই আপনাদের পেছন পেছন আসছিলাম।'

সর্দ্দারজীর জন্ম ও বৃদ্ধি, কলকাতার ভবানীপুরে। সেই সুবাদেই বোধ হয় বাংলা বলেন তিনি প্রায় বাঙ্গালীদের মতই গড় গড় করে।

অবিনাশ খুবই কৌতূহল বোধ করছিলেন সর্দ্দারজীর কথা শুনে।

মাতঙ্গের কপালের গড়নে আবার কি খুঁজে পেয়েছেন এই শিখ জ্যোতিষী ?

বুজরুকীর ব্যাপার নয় তো ?

কিন্তু, ছয়বার জেলখাটা আগুনের মত খাঁটি মানুষ নরেন বৈরাগী যাঁর প্রশংসা করেছেন একটু আগেই, তাঁর কোন কথাকে বুজরুকী মনে করার মত প্রবৃত্তিও হয় না।

'কিন্তু ছেলের হাত দেখার আগে, একবার জন্মদাত্রীর বাঁ-হাত-খানা দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমার। দেখতে পাবো কি ?

সলজ্জ হাসি হেসে বাঁ-হাতের তালুটা মেলে ধরলেন প্রাণদা সর্দ্দারের সামনে। মুহূর্তের জন্যে একবার হস্তরেখাগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিখ বললেন—'ব্যস, বহুৎ ধন্যবাদ, মা। আপনার তো আরও দুই লেড়কা আছে !'

'আছে, বাবা।'

'সবসে ছোটা তো এই ছেলেটিই ?'

'হ্যাঁ বাবা !'

'এখন তো আপনার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, মা! বহুৎ লোকসানি'—'হ্যাঁ, বাবা।'

'তিন লেড়কী ?'

সোৎসাহে বৈরাগী বলে উঠলেন—'ঠিক !'

বেঞ্চির একধারে বসে বাঁ হাতে বয়ে নিয়ে আসা জ্যোতিষ শাস্ত্রের বইগুলি নিজের কোলের ওপর রেখে, সর্দ্দার তাকালেন এবার মাতঙ্গের দিকে।

অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে শুধালেন—'ওর কপাল সম্বন্ধে আপনি কি যেন তখন বলছিলেন সর্দ্দারজী।'

'হ্যাঁ বাবুজী, আশ্চর্য কপাল এই ছেলেটির। এমন কপালকে আমরা বলি—বুলন্দ এক্‌বাল। লাখে একটি মেলে এমন কপাল।' বলে, মাতঙ্গের ছোট দক্ষিণ হস্তটি নিজের ইয়া চওড়া চেটোতে তুলে

নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন মন দিয়ে। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে, কচি হাতের রেখাগুলোর উপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন কয়েকবার। তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি—'ওর কপাল দেখে যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই।'

'কি দেখলেন, বাবা?' প্রাণদার স্বরে অধীরতা ফুটে উঠল। 'আপনি রাজার মা হবেন— ওর হাতে জ্বল জ্বল করছে তার চিহ্ন।'

'রাজার মা! আপনি বলছেন কি গণক ঠাকুর! ওকে যে চারবেলা পেট ভরে খেতে দেবার মত অবস্থাও নেই আমাদের আজ! ও রাজা হবে কেমন করে?'

'হাতের রেখার জোরে, ওর নসিবের জোরে। ওযে বুলন্দ এক্‌বাল! ওকে রুখে রাখতে পারবে না কেউ।'

বৈরাগী বললেন—'এতটা জোর দিয়ে আপনি বলছেন। মাতঙ্গ রাজা হবে?'

শিখ ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় একটা হাতের তালুতে আর একটা হাতের মুঠি ঠুকে বলে উঠলেন— 'আলবৎ হবে। গুর্ণামের গণনা কখনও ভুল কথা বলে না, নরেন ভেইয়া।'

'আহা, তাতো আমি জানি সর্দ্দারজী। কিন্তু, একটা অজ পাড়াগাঁয়ের অতি অভাবী পরিবারের ছেলে তো! তাই— বুঝোবার চেষ্টা করলেন বৈরাগী।

জ্যোতিষী বলে উঠলেন—'ধূলোমুঠি ধরবে ও, সোনামুঠি হয়ে যাবে।'

'আর, লেখাপড়া?' মাষ্টারের প্রশ্ন।

'হবে না।' সাফ জবাব এলো সর্দ্দারের মুখ থেকে।

প্রাণদা শুধালেন—'মুখ্যু ছেলে কি রাজা হতে পারে, বাবা?'

'পারে মা, নিশ্চয় পারে।' শিখ বললেন—'ওর বুলন্দ এক্‌বাল ওকে রাজা বানাবে মা। আমি বলে গেলাম। আমার কথাকে অবিশ্বাস করবেন না।' এই বলে, একটু থেমে দুই চোখ বন্ধ করে

মুহূর্ত্তের জন্যে নীরব থাকার পর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন পুনরায় —'আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যেন, নীল সমুদ্রের তীরে, নয় তলা প্রাসাদ গড়ে তুলেছে আপনার ছেলে। সেই প্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে পাঁচতলা, তিনতলা আরও অনেক বাড়ী! তিন-চারটে দামী মটর গাড়ী, অনেকগুলি ভ্যান, ট্রাক, বাস, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোনে থৈ-থৈ করছে সেই প্রাসাদ আর বাড়ীগুলো। এরোপ্লেনে করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বুলন্দ একবাল……'

'ওসব বিশ্বাস করিনা আমি' সরু সুরেলা গলায় তীব্র অবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলে সর্দ্দারের ভবিষ্যৎ দর্শনকে হঠাৎ তছনছ করে দিল মাতঙ্গ। 'মাষ্টারমশাই বলেছেন, ভাগ্য তৈরি করে নিতে হয় নিজের হাতে, ভাগ্য কপালে লেখা থাকে না।'

'মাষ্টারজী তো ঠিকই বলেছেন। তোমার কপাল তোমার মনকে বাধ্য করবে তোমার নিজের ভাগ্যকে তৈরি করতে।' জ্যোতিষী বললেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে জননীর মন। এসব কি শুনোলেন আজ পাঞ্জাবী জ্যোতিষী? এও কি সম্ভব? আধ ময়লা প্যান্ট-জামাও ভালভাবে জোটে না যে ছেলের আজ, সেই হবে নয়তলা বাড়ীর মালিক!

মনের মধ্যে যতসংশয়ই থাক, পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার বাণী কেউ শোনালে—সব মায়ের প্রাণেই উল্লাস জাগে। প্রাণদারও সেইরকম কিছু একটা হল বোধ হয় মনে। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলের খুঁটে বেধে রাখা রুপোর টাকাগুলি বের করে, তারই থেকে একটি টাকা তুলে দিতে চাইলেন সর্দ্দারজীর হাতে বললেন—'সামান্য এই দক্ষিণাটা নিন বাবা।'

(যে সময়কার ঘটনা এখানে বর্ণিত, সে সময়ে এক টাকার দাম বড় কম ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর আগে জ্যোতিষী উচ্চারণ করেছিলেন এই ভবিষ্যদ্বাণী। সুতরাং প্রাণদা জ্যোতিষীকে একটি মাত্র টাকা দিচ্ছেন শুনে আজকের পাঠক-পাঠিকারা তাঁকে যেন কৃপণ না ভাবেন একবারও।)

জ্যোতিষী তাঁর বিরাটাকৃতির দেহটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন—কোটী কোটী টাকার সম্পত্তির মালিক হবে যে ছেলে তার গর্ভধারিণীর হাত থেকে মাত্র একটা টাকা নেবার মত বুদ্ধু আমি নই মা-জী। যখন ও বড় হবে, ধনী হবে, তখন আমি আবার আসবো আপনার কাছে। এসে, বক্শিস্ আদায় কয়ে নেবো।'

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন সর্দ্দারজী। গভীরভাবে কি যেন ভাবলেন কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে। তারপর, একটু গম্ভীর হয়েই আবার কথা বললেন—'মাজী!'

'কি বাবা?'

'একটা খারাপ সংকেত ও দিচ্ছে কিন্তু আপনার ছেলের হাত।' 'খারাপ সংকেত?' মুহূর্ত্তে বিকৃত হয়ে উঠল জননীর কণ্ঠ পুত্রের আপদাশঙ্কায়, খারাপ সংকেত আবার কি দেখতে পেলেন মাতুর হাতে?'

'রাজদণ্ড। পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে আপনার ছেলেকে বেশ কয়েকবার।'

'সে কি?' প্রাণদার সঙ্গে চম্‌কে উঠলেন ছোট্ট দোকান ঘরটায় উপস্থিত প্রায় সকলেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোলের বইগুলি আবার বাঁ হাতে তুলে নিয়ে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শিখ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—'হ্যাঁ, মা-জী, এই আপনার ছেলের ভবিতব্য।' বলেই, দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চক্ষের পলকে হারিয়ে গেলেন শীতলা-দেবীর মেলা-প্রাঙ্গণে সমবেত বিরাট জনতার ভিড়ে।

আর, মুখখানি অন্ধকার করে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষীর অনুসরণে প্রবৃত্তা হলেন প্রাণদাময়ী। গেল কোথায় ঐ গৈরিকবেশী লোকটা? রাজদণ্ডের হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে—একটা তাবিচ-মাদুলী তো দিতে পারেন উনি ইচ্ছে করলেই।

অন্য গৃহস্থ বধূরাও প্রাণদার পশ্চাতবর্ত্তিনী হলেও, মাতঙ্গ কিন্তু রয়েই গেল দোকানের মধ্যে।

'জানেন মাষ্টার মশাই—বাবা বলেছে আমায় পয়সা জমাতে' মাতঙ্গ জানালো।

অবিনাশ জিজ্ঞেসা করলেন—'কেন ?'

'সপ্তডিঙা কিনতে হবে যে।'

বৈরাগী বড় বড় চোখ করে তাকালেন এবার অবিনাশের দিকে। অবিনাশ একটু হেসে বললেন—আপনাকে একটু আগে বললাম না কাকা। ও যে বাণিজ্য করতে যাবে চাঁদ সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগরের মত। তাই ওর সপ্তডিঙা চাই।'

একটা চোখ ছোট করে একটু হেসে বৈরাগী বললেন, 'তাই নাকি ? বাণিজ্য করে, নীল সাগরের তীরে নয়তলা প্রাসাদ গড়ে তুলবে বুঝি আকাশ-ছোঁয়া ? কি গো বণিক মশাই ?' বৈরাগীর কণ্ঠে রহস্যের আমেজ।

'না-না।' ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিল ছেলেটা 'নয়তলা বাড়ী বানাতে যাবো কিসের জন্যে ? আমি বাণিজ্যের সব টাকা তুলে দেবো আমার বাবা-মার হাতে।'

'খুব ভাল কথা। তাই দিও! কিন্তু……' একটু থামলেন নরেন বৈরাগী।

'কিন্তু কি ?'

'কিন্তু, তার আগে তোমার বাবার মত লক্ষ লক্ষ ভাল মানুষকে যারা শুষে শুষে গরীব করে দিল, মানুষের মত বাঁচার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিল, সেই সব সাদা শয়তানদের এ-দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলে ভাল হত না ?'

'সাদা শয়তান ? তারাই বুঝি আমার বাবার মত এমন দয়ালু এমন পরিশ্রমী মানুষকে গরীব করে রেখেছে ?'

'হ্যাঁ গো! ঐ সাদা শয়তানগুলোকে তাড়িয়ে যদি দিতে পারো, তা হলে কেবল তোমার বাবার নয়, দেশের সব গরীবদের আর কোন অভাব থাকবে না।'

'কিন্তু, ঐ সাদা শয়তানরা থাকে কোথায়?'

'আমাদের চারধারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওরা আমাদের রক্ত শুষছে। আমাদের সোনার দেশকে শ্মশান করে দিয়েছে। এ দেশের সব কিছু লুটে নিয়ে শয়তানগুলো রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে। আর, তোমার বাবা শান্ত নিরীহ মানুষ হয়েও, পেট ভরে ভাত জুটোতে পারছে না তোমাদের জন্যে।'

বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবার মাতঙ্গ—'ওরা কারা সাধুবাবা?'

'ইংরেজ।'

'ঐ সাহেবরা?'

'হ্যাঁ রে!'

'ওরাই সেই শয়তান—যারা আমার বাবাকে গরীব করে রেখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওদের তাড়াবো কেমন করে? ওদের যে কামান, বন্দুক, পিস্তল আছে?'

হঠাৎ কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বৈরাগী ফিসফিস করে বললেন, 'আমাদেরও আছে। এই, এঈ দ্যাখ—'

কাঁধ থেকে ঝুলোনো ঝোলার ভেতর থেকে, গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো একটি বস্তু বের করলেন বৈরাগী। কাপড়টা সরাতেই বেরিয়ে পড়লো সত্যি সত্যিই একটি পিস্তল। চারিদিকে নজর রাখতে রাখতে বৈরাগী আবার নিম্নস্বরে বললেন—'মাষ্টারের বাপ তো প্রথম মহাযুদ্ধে গিয়েছিল—ডাক্তার হয়ে। ওঁর কাছে একটা দো-নলা আছে। ওঁর সাথে সুন্দরবনের লাটে যা শিকার করার নাম করে, উনিই শিখিয়ে দেবেন বন্দুক ছোঁড়া। তারপর, বিপিনদার অনুমতি নিয়ে, পিস্তল ছোঁড়াও শিখিয়ে দেবো আমি।'

'বিপিনদা কে ?'

'বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রে! নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো সবার কাছে। বিজয় সিং নাহার. কালী মুখুজ্জে, তিনকড়ি গাঙ্গুলী—সবাইকে দেখতে পাবি।'

সত্যিকার একটা পিস্তল যে সাধুবাবার ঝুলি থেকে ঝাঁ করে বেরিয়ে আসবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি বালক মাতঙ্গ। কিন্তু পিস্তলটা দেখার পর থেকেই—কান মাথা দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসতে চাইল যেন তার। উত্তেজনাকম্পিত স্বরে বালক শুধোলো—'যাদের নাম বললে, তারা সবাই বুঝি ঐ সাদা শয়তানদের তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে ?'

'হ্যারে! কেবল কি ঐ ক'জন ? হাজার হাজার মানুষ এখন পণ করেছে—ঐ অত্যাচারী ইংরেজকে তারা তাড়াবেই। সুভাষ বসুর নাম শুনেছিস ? মহাত্মা গান্ধী ?'

'হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই ওঁদের কথা অনেক বলেছেন আমার কাছে।'

'ওঁরা সবাই আমাদের দলের।'

'তবে আমাকেও তোমাদের দলে নাও না সাধুবাবা। আমার বাবাকে যারা গরীব করে রেখেছে, এত কষ্ট দিচ্ছে, সবার আগে আমি তাদেরকে তাড়াবো এই দেশ থেকে। তারপর, বাবা-মার হাসিমুখ দেখে, একদিন, সপ্তডিঙায় চড়ে চলে যাবো বাণিজ্য করতে দূরে—অনেক দূরের দেশে।'

'তোমাকে তো নেবোই আমাদের দলে। এত ভাল গান গাইতে পারো তুমি, গুলতিতে তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ, বাবা-মার দৈন্যদশা সহ্য করতে না পেরে, তুমি এই বয়েসেই বাণিজ্যে যাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছো। এমনি বড় স্বপ্ন দেখার শক্তি আছে যে সব ছেলের, তাদেরকেই তো সবচেয়ে বেশি দরকার আমাদের আজ।' এই পর্য্যন্ত বলে, পুনর্বার হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে বৈরাগী বললেন,

'খুব সাবধান, এসব পিস্তলটিস্তলের কথা ভুলেও কাউকে বলবি না। বাবা-মাকেও নয়। বুঝলি?'

সোৎসাহে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলো মাতঙ্গ।

বৈরাগী এবং মাষ্টার—তুইজনের মুখই বেশ চক্‌চকে দেখাচ্ছে—মনে হল। মাষ্টারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বৈরাগী বললেন—'অভিমন্যুকে জালে জড়িয়ে নিলুম মাষ্টার, তাকে জালে আট্‌কে রাখার দায়িত্ব তোমার। এই বয়েসের ছেলেদেরই মনের মত করে তৈরি করে নেওয়া সোজা। তুমি পরশুই ওর মাকে বলে, বেড়াবার নাম করে ওকে নিয়ে যাও তোমার বাবার সঙ্গে সুন্দরবনের লাটে, শেখাতে শুরু করো বন্দুকের ব্যবহার। আমি মাস খানেক পরে আবার একবার ঘুরে যাবো না হয় এ দিকে।'

॥ চার ॥

পচা কবিরাজ মশাই চিন্তিত মুখে বললেন—'তাই তো, মা, এ তো বড় ভাবনার কথা হল। যতবার ছেলেটা লাটে যাচ্ছে বেড়াতে ততবারই ওর ডানদিকের কলার বোনের ঠিক নীচটায় আসছে ফুলিয়ে। বেড়াতে গেলে, কণ্ঠার হাড়ের কাছে এমন ফুলে উঠবে কেন লাল হয়ে? স্পষ্ট মনে হচ্ছে কোনো আঘাতে এমন হয়েছে। অথচ ও বলছে—'

'বলছি তো কবরেজ জ্যেঠু, আমার কোন চোট্ লাগে নি।' মাতঙ্গ বলল।

'এইবার নিয়ে ক'বার হল, মা, এমন লাল হয়ে ফুলে ওঠা?' কবিরাজ জানতে চাইলেন প্রাণদাময়ীর কাছে।

'তা পাঁচ-ছবার তো হবেই।'

'ঐ একই জায়গায় প্রত্যেকবার ফুলে ফুলে উঠছে। ছেলেটা আমায় কিন্তু চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মা। যাই হোক, অন্যান্য বারের মত এবারও মালিশ আর বটিকা দিয়ে গেলাম। কিন্তু, বার বার এমন হওয়াটাতো ভাল নয়।'

'তুমি কিছু চিন্তা কোরো না জ্যেঠু, ও মালিশ করলেই কমে যাবে।' বৃদ্ধ কবিরাজকে সান্ত্বনা দিল বালক।

কিন্তু যন্ত্রণা যাবে কোথায়? যতই মোটা করে তোয়ালে কাঁধের কাছে দিয়ে তার ওপরে বন্দুকের বাট্-টা লাগাক্ না কেন, গুলি বের

হবার সময় 'ব্যাক্' যখন করে, তখন কচি কাঁধে কি সইতে পারে ? দুই তিনটে গুলি বের হলেই লাল হয়ে ফুলে ওঠে ডান ঘাড়ের নীচটায় —ঠিক কণ্ঠার হাড়ের কাছে। তবু উৎসাহে ভাটি পড়ে না। কিন্তু যন্ত্রণা ? যন্ত্রণা কি ছেড়ে কথা কইবে ? সারা রাত ঘুম আসে না, কেবল 'উঃ আঃ' আর ছটফটানি। ফোলা জায়গাটার ওপরে আস্তে আস্তে কবিরাজের দেওয়া ওষুধটা মালিশ করতে করতে প্রাণদা প্রশ্ন করলেন—'সত্যি বলবি তো মাতু ?'

'কেন এ কথা জিজ্ঞেসা করছো, মা ? আমি তো সব সময় তোমার কাছে সত্যি কথাই বলি।'

'বল্ তবে ঠিক করে—কেন যখনই তুই মাষ্টারের সঙ্গে সুন্দরবনের লাটে বেড়াতে যাস, তোর কাঁধের ঠিক এই জায়গাটাতেই ফুলে ওঠে তখনই ?'

মাতঙ্গ নীরব। 'কই, উত্তর দিলিনে আমার প্রশ্নের ?' মার পুনর্প্রশ্ন। 'অনেকক্ষণ তো মালিশ হয়েছে, মা। এবার তুমি ঘুমোতে যাও। আমারও ঘুম পাচ্ছে।'

'তুই মিথ্যে বল্‌ছিস ? এত যন্ত্রণায়—কখনও ঘুম আসতে পারে ? আমার কথার জবাব না দিয়ে তুই পালাতে চাচ্ছিস্।'

আট বছরের বালক ! জননীর কাছে কোন কিছু গোপন করতে সে জানে না। যত বড় দুষ্টুমিই করুক, মার কাছে না বলা পর্যন্ত শান্তি পায় না সে মনে। অথচ, সেই তাকেই আজ কি বিপদেই না পড়তে হয়েছে। একদিকে নরেন বৈরাগীর কাছে দেওয়া কথা—বন্দুক পিস্তলের কথা জানতে দেবে না সে কাউকে, অন্যদিকে জননীর শঙ্কাবিক্ষুব্ধ মনের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন—কেন বার বার তার কণ্ঠার হাড়ের কাছে অমন ফুলে ওঠে—যখনই সে লাটে যায় বেড়াতে ? এই দুই-এর টানা-পড়েনে পড়ে শিশুমন বিপর্যস্ত প্রায়।

প্রাণদা তাঁর এই একগুঁয়ে ডানপিটে কিন্তু অকপট সরল হৃদয় পুত্রটিকে বেশ ভালভাবেই জানেন। তাই, পুত্রের দ্বিধা আর নীরবতা লক্ষ্য করে ক্রমেই তিনি নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন—লাটে গেলেই অমন ফুলে ওঠার পেছনকার রহস্য সম্পর্কে। কপট অভিমানে তিনি এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'বেশ তো, এখন থেকে তোমার কোন কথার জবাব আমিও দেবো না।' এই বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই—মায়ের আঁচল চেপে ধরলো মাতঙ্গ। বলল—'কেমন করে জবাব দেবো তোমার প্রশ্নের, ঐ সাধুবাবা মানা করেছে না?' ফিরে এসে, পুত্রের পাশটিতে চৌকির ওপর বসে পড়ে, প্রাণদা শুধালেন—'কোন্ সাধুবাবা?'

'ঐ যে, খুব ভাল গান গায়। যার অনেক গান আমি শিখে নিয়েছি।'

'ঐ বৈরাগী দাদা?'

মাতঙ্গ ঘাড় নাড়লো। 'বৈরাগী কি বলতে মানা করেছে তোকে?' পেটের কথা বের করার চেষ্টা করলেন মা।

'সেই যে মানা করলে না পিস্তল-বন্দুকের কথা কাউকে বলতে?'

জননীর পায়ের নীচের মাটি যেন কেঁপে উঠল ত্রাসে। তিনি আঁতকে উঠলেন—'পিস্তল-বন্দুকের কথা? এর মানে?'

একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে ছেলেটা। এ সে কি করলো? বৈরাগী বলেছিলেন—'ইংরেজ তাড়ানোর কাজ যদি করতে চাস, কথা দে, আমরা কি করি না করি, সে সব কথা কারও কাছে বলবি না। এমন কি নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছেও না।' আর সে কি না বলে ফেলল—বন্দুক-পিস্তলের কথা তার মায়ের কাছে? প্রাণদা ততক্ষণে ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সব হারিয়ে, বুকের যন্ত্রণায় কাতর পুত্রের গালে ঠাস করে একটি চড় কষিয়ে ক্রোধে কান্নায় চিৎকার করে

উঠলেন, বন্দুক-পিস্তলের কথা সব খুলে বল্ শিগগিরি, নইলে কাল আমি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবো ঐ বৈরাগীকে।' [illegible] মাতঙ্গ। কী সর্বনাশ। মা তো জানে না—সাধুবাবা কত ভাল লোক। পিতার মত ভাল আর নিরীহ মানুষদের গরীব করে রেখেছে যে শয়তানের দল, তাদেরকে এ-দেশছাড়া করতে কত কষ্টই না স্বীকার করেছেন ঐ সাধুবাবা। না খেয়ে না শুয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি দিনের পর দিন, ইংরেজের পুলিশ ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরেছে ছ'বার। গত পাঁচ-ছয় মাসে সাধুবাবা যতই কাছে টেনেছে এই দুরন্ত স্বভাবের তেজী প্রতিভাবান ছেলেটাকে, ততই কতই না আশ্চর্য্য কথা জানতে পেরেছে সে সাধুবাবা সম্বন্ধে। সাধুবাবা লাঠি খেলতে জানে, তীর-ধনুকে আশ্চর্য্য নিশানা তার হাতের, বন্দুক-পিস্তলে ওস্তাদ। কলকাতায় মাস তিনেক আগে তাকে নিয়ে গিয়েছিল সাধুবাবা চার নম্বর দুর্গা পিতুরি লেনে—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করতে। মাতঙ্গ প্রণাম করেছিল সেই দৃপ্ত-নয়ন মানুষটিকে। ওঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আর একজন ভয়ঙ্কর তেজস্বী পুরুষ—সাধুবাবা তাঁর নাম বলেছিলেন গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ও নাকি ইংরেজ তাড়ানোর কাজে মেতে আছেন, বাড়ী তাঁর মালাঙ্গা লেনে। কিন্তু, সবিস্ময়ে মাতঙ্গ লক্ষ্য করেছিল—ঐ দুজনেই কত সমীহের সঙ্গে কথা বলছিলেন গেরুয়াধারী ছিন্ন চপ্পল-পরা সাধুবাবার সঙ্গে। আর সেই সাধুবাবাকে জননী ধরিয়ে দেবেন পুলিশের হাতে—যদি সে বন্দুক-পিস্তলের সব কথা খুলে না বলে তাঁকে।

'কিন্তু, মা, আমি যে কথা দিয়েছি………' বালকের দ্বিধা তবু যায় না। মা বললেন, 'বেশ তো, আমিও কথা দিলাম তোকে—তুই যা বলবি আমাকে আজ, আমি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারবে না তা।'

নিশ্চিন্ত হল এবার বোধ হয় মাতঙ্গ। বললে—তবে বলবো, মা। তোমাকে বলতে না পেরে আমার মনেও শান্তি ছিল না।' বালিশ থেকে নিজের মাথাটা তুলে মায়ের কোলে রাখল। জননী সস্নেহে পুত্রের মাথায় বুকে হাত বুলোতে লাগলেন। কিন্তু বুক দুরু দুরু করছে তখনও। বন্দুক, পিস্তল, নিয়ে কি সব করছে তাঁর পুত্র ঐ ঘর-বিবাগী বৈরাগীর সঙ্গে ?

'এইবার বল শুনি।' প্রাণদা বললেন—'সত্যি করে বল—যতবার লাটে যাস, অমন লাল হয়ে ফুলে ওঠে কেন তোর বুক ?'

'আমি যে বন্দুক ছোঁড়া শিখছি, মা।'

'বন্দুক ছোঁড়া শিখছিস ? কার বন্দুক ? কে শেখাচ্ছে ?'

'প্রথমে শেখাচ্ছিলেন মাষ্টারমশাই-এর বাবা—দোনলায়। কিন্তু আমার বুকে সুপুরীর মত এমনি ফুলে উঠতে দেখে, তিনি আর শেখাতে রাজী হলেন না। তাই, এখন শিখছি—'

মাতঙ্গ থামল। আর, অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণদা প্রশ্ন করলেন 'এখন শিখছিস কার কাছে আবার ?'

সরস্নার সুরেশ পালের কাছে। জানো মা, সুরেশদা বলেছে, আর একটু বড় হলেই আমাকে রাইফেল ছোঁড়া শিখিয়ে দেবে। মস্ত নাম-করা শিকারী তো। আচ্ছা, মা, রাইফেল কেমন দেখতে হয় ? ছোট, না বড় ? কামানের মত, না বন্দুকের মত ?'

'আমি ওসব কেমন করে জানবো ? কিন্তু এসব বন্দুক ছোঁড়া-ছুঁড়ি শিখে কি করবি তুই। অবিনাশ মাষ্টারের বাপের মত যুদ্ধে যাবি, না—সুন্দরবনে যাবি বাঘ মারতে ?'

'ঐ ইংরেজদের তাড়াবো, মা, এই দেশ থেকে।' এতক্ষণের বেদনা-কাতর চোখে হঠাৎ দেখা দিল আগুনের ফুলকি মাতঙ্গের।

'কী সাংঘাতিক ? ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় স্বরে জননী কাঁদো-কাঁদো

হয়ে শুধালেন,—'এসব বুদ্ধি তোর মাথায় কে ঢুকিয়েছে মাতো? ঐ বৈরেগী বুঝি?'

'হ্যাঁ মা। না হলে এসব কথা আমি জানতে পারবো কেমন করে? ঐ ইংরেজ সাহেবরাই তো তোমাকে-বাবাকে এমন গরীব করে রেখেছে। তোমাদের সব শুষে নিয়ে ওরা রাজার হালে মজা করছে, দামী দামী গাড়ী চড়ছে, দামী দামী জামা কাপড় পরছে আর দামী দামী সব খাবার খাচ্ছে। আর তোমাদের কপালে? তোমাদের অসুখ হলে—একটা ভাল ডাক্তার ডাকতে পারো না, চারবেলা ভর-পেট খেতে পাও না, একটা কাপড় ছিঁড়ে যায় যখন, তখন তালি দিয়ে পরতে হয় সে কাপড়, বর্ষায় চালের খড়ের ফাঁক দিয়ে জল পড়ে, সারারাত বসে থাকো না ঘুমিয়ে।'

'কিন্তু এ সবের জন্যে কি সাহেবরা দায়ী? ঈশ্বর যা লিখেছেন আমাদের কপালে, তাই তো হবে।'

'না, মা। ঈশ্বর ওদের হাতে বন্দুক দিয়েছিলেন, ওরা সেই বন্দুকের জোরে এতদিন বাবা আর তোমাদের মত সৎ আর মহৎ মানুষদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, তোমাদের সর্ব্বত্র লুটে নিয়েছে। তাই, এবার ওই ঈশ্বরই বন্দুক তুলে দিচ্ছেন আমাদের হাতে, ওদের আর রক্ষা নেই, তুমি দেখতে পাবে।'

'না, বাবা, না। এসব সর্ব্বনেশে কথা তুই বলিস নে মাতো, আর কখনো বলিস নে, এসব কথা সাহেবরা শুনতে পেলে—তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওই ক্ষুদিরামের মত ফাঁসি দিয়ে দেবে নিশ্চয়, তোকে তখন কেউ বাঁচাতে পারবে না, কেউ না।' বলতে বলতে দুই হাতে চোখ মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন প্রাণদা। পুত্র নিঃশব্দে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে, মায়ের দুই হাত তাঁর চোখ থেকে নামিয়ে দিয়ে, তাঁর অশ্রু মুছে দিতে দিতে বলল—'একদিন আদি গঙ্গার জল হাতে নিয়ে মাষ্টার মশাই-এর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—

তোমার আর বাবার অভাব-অনটন ঘুচোতে আমি বাণিজ্য করতে যাবোই বিদেশে, তাই সপ্তডিঙ্গা কেনার জন্যে পয়সা জমাচ্ছি আমি রোজ, আজও। আর, সেদিন, ওই শেতলা তলার মেলায় আশ্চর্য্য মানুষ ওই সাধু বাবাকে কথা দিয়েছি মা শেতলার পবিত্র মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে—আগে এই অত্যাচারী সাদা শয়তানদের তাড়াবো এ দেশ থেকে, তারপর গঙ্গায় সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে যাত্রা করবো—বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।

'এ দুটো প্রতিজ্ঞাই আমি রাখবো, মা, তুমি দেখো।'

সে রাত্রে প্রাণদার চোখে ঘুম এলো না মুহূর্তের জন্যেও। ঘুরে ঘুরে পাঞ্জাবী জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই মনে আসতে লাগলো তাঁর। মাতোর কপালে নাকি রাজদণ্ড অবধারিত।

॥ পাঁচ ॥

বারো ছাড়িয়ে তেরোতে যখন পা দেবে মাতঙ্গ, তখনই এক অদ্ভুৎ অভিজ্ঞতা লাভ করলো সে। নরেন বৈরাগী একদিন অপরাহ্নে, ছেলেটা যখন মহেশতলা স্কুল থেকে ফিরছে, ইসারায় ডাকলেন। অনেকদিন পরে সাধুবাবার সাক্ষাৎ পেয়ে ভারী খুশি মনে দৌড়ে তাঁর কাছে যেতেই, উনি ওর হাত ধরে নিয়ে গেলেন এক বাঁশ ঝাড়ের কাছে। তারপর এদিকে ওদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে, কাগজে মোড়ানো ছোট একটা কি যেন গুঁজে দিলেন ওর হাতে? তারপর ফিস ফিস করে বললেন—এ রিভলভারটা বাড়ীর বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখবি। কাল এই সময় এই খানেই এসে দেখা করবে তোর সঙ্গে একটা বছর বাইশের ছেলে, বাঁ হাতের আঙ্গুলে তামার আংটি আছে দেখবি। তারপর এটা ওর হাতে দিয়ে দিবি, বুঝলি? যে ছেলেটা কাল আসবে, সেও খুব ভাল ছেলে। বি, এ, পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছে। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। তবু দেশের কাজে একেবারে মেতে উঠেছে। তাড়াতাড়ি করে কাগজের মোড়কটা শার্টের নীচে কোমরে গুঁজে নিয়ে বৈরাগীর সঙ্গে পথ চলতে চলতে মাতঙ্গ বলল আবদারের সুরে—'সবাইকে স্বদেশী করতে দিচ্ছেন, আর আমাকে বসিয়ে রেখেছেন এই গ্রামের মধ্যে। আমি বুঝি কাজ করতে পারি নে?'

'কে বলছে পারিস নে? এই তো, স্বদেশী কাজই তো করছিস। রিভলভার লুকিয়ে রাখা কি কম বড় কাজ?'

'না, আমায় আরও কাজ দিন। অনেক কাজ দিন। আপনি বন্দুক শিখতে বললেন, আমি বন্দুক শিখলাম। আপনি মটোর গাড়ী চালানো শিখতে বললেন, সরস্থনার স্থরেশ পালের কাছ থেকে বন্দুক, রিভলভার শেখার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চালানোও শিখে নিয়েছি আমি। তবে কেন আমায় আরও বেশি কাজ দেবেন না? আর কাজ না করলে, তাড়াতাড়ি তাড়াতে পারবো কেন ইংরেজদের? ওদের না তাড়ালে, আমি বাণিজ্য করতে যেতে পারবো না যে!'

একটু ভেবে নিয়ে, মাতঙ্গের দুই গালে সস্নেহে হাতের টোকা দিয়ে বৈরাগী বললেন—'ঠিক আছে। যখন বলছিস, চল পরশুই তোকে নিয়ে যাবো তিনকড়িদার কাছে। ছেলে বাছার দায়িত্ব রয়েছে কিনা তাঁরই হাতে।'

'তিনকড়িদা কে?'

'ও বাবা, মস্ত কাজের লোক। আমাদের এই বিপ্লবের কাজে যে সব ছেলেরা আসতে চায় কাজ করতে, তুই কি ভাবছিস—তাদের সবাইকেই কাজ করতে দিই আমরা? কখনও না। আগে হয় তিনকড়িদা নয় তো বিপিনদা নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে ঐ ছেলেদের। তারপরে, যদি তারা যোগ্য বলে বেছে নেন, তবেই ঐ ছেলেদের নেওয়া হয় আমাদের কাজে।'

'কোথায় থাকেন সেই তিনকড়িদা? কি করেন?'

'নেও ঠেলা! এই পুচকে ছেলে যে একেবারে জজের জেরা শুরু করে দিল দেখি। শোন্ বোকাটা, স্বদেশী কাজে যখন নামবি, নেতা যা বলবে, তাই করবি। বেশি প্রশ্ন করবি নে, কথা বলবি নে।'

বৈরাগীর কথায় বোধ করি একটু ধমকের স্থরই গুমরোচ্ছিল, মাতঙ্গ মুখটা কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—পথ চলা বন্ধ করে।

তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, আস্তে পিঠে হাত বুলোলেন বৈরাগী। স্নেহের স্বরে বললেন—'কিরে কষ্ট পেলি মনে, না ?'

'না।'

'হ্যাঁ, সামান্য কথায় মনে কষ্ট হলে চলবে কেন ? তুই কি মেয়ে-ছেলে ?' বলে, মুহূর্তের জন্যে কথা বন্ধ রেখে, আবার বললেন 'চিত্তরঞ্জন দাস যখন কলকাতায় মেয়র হলেন, তখন সুভাষ বোসকে তিনি করলেন কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। এই সুভাষের অধিনায়কত্বেই কর্পোরেশনের উদ্যোগে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে কলকাতায়। কর্পোরেশনের এই অবৈতনিক শিক্ষা-বিভাগের পরিচালক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনকড়িদার পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকেই। যখন কর্পোরেশনের টিচার্স ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কে. পি. চট্টোপাধ্যায় তিনকড়ি গাঙ্গুলীকেই করলেন সেই স্কুলের প্রথম ট্রেনর। এবার খুশি তো ? তিনকড়িদা কে, কি করেন জানতে চেয়েছিলি, এই তো জবাব পেলি।'

মাতঙ্গ পথ চলতে লাগল আবার নীরবেই। সাধুবাবা একটু আগেই মানা করেছেন—বেশি কথা বলতে। বলেছেন, বিপ্লবী হতে গেলে নাকি—বেশি প্রশ্ন করা ঠিক নয়।

মাষ্টার মশাই-এর কাছে কত গল্পই না শুনেছে মাতঙ্গ এই মানুষটির সম্পর্কে। ইতিহাস, ইংরেজী আর অর্থনীতিতে এম. এ.। ইংল্যাণ্ডের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীও না কি আছে এঁর। ছাতুবাবুর বাজারের কাছে—মস্ত বড় বাড়ী এঁর বাবার। যে ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে ইনি পথের ধূলোয় এসে দাঁড়িয়েছেন, সেই ইংরেজই এঁর পিতাকে ভূষিত করেছে 'রায়বাহাদুর' খেতাবে। পাবনা, না বগুড়ায় কোথায় যেন এঁর বাবার বিরাট জমিদারী। অথচ এঁর কি দুর্দশা। ছেঁড়া গেরুয়া কাপড়, তালি দেওয়া বানিয়ান। চুলে নেই এক ফোঁটা তেল। পায়ে টায়ার কেটে তৈরী করা চটি। ফর্সা গায়ের রং রোদে-বর্ষায়

তামাটে হয়ে গেছে। কিন্তু মুখে ছাখো, সবসময়ে খুসির হাসিটি লেগে আছে। এমন মানুষ যা বলেন, তা না শুনে উপায় কোথায়!

মহেশতলার পাশের গ্রামই শিবরামপুর।

কিন্তু নরেন বৈরাগী গ্রাম পর্য্যন্ত আর গেলেন না। বিরাট নিমগাছটার কাছে যেখানে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে শিবরামপুরের দিকে, সেইখানে এসেই--বিদায় চাইলেন মাতঙ্গের কাছে। বললেন—বেহালার ট্রাম ডিপোর কাছে পরশু বেলা ৯টায় হাজির থাকিস, সেদিন তো বিশ্বকর্মা পূজোর ছুটি! আমি এসে তোকে নিয়ে যাবো তিনকড়িদার কাছে, বুঝলি?'

ঝুলিটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধে ঠিকমত করে বসিয়ে নিয়ে, হন্ হন্ করে পা চালিয়ে দিলেন বৈরাগী। এবার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাতঙ্গের রিভলভারটার কথা। এক্ষুনি লুকিয়ে না ফেলতে পারলে—যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। কত বিশ্বাস করে সাধুবাবা এ জিনিস তার কাছে রাখতে দিয়েছেন। বলেছেন, এটাও কি কম বড় কাজ?

গ্রামেরই এক প্রান্তে, যেখানে মস্ত অশ্বত্থ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, প্রকাণ্ড কাণ্ড নিয়ে ঝুরির দড়ি ঝুলিয়ে—বুড়ো শিবের মন্দিরের ঠিক পাশেই, সেইখানে গিয়ে, মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে, তার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো রিভলভারটা। কিন্তু তখনও সে জানে না—আর কয়েক মুহূর্ত পরেই, কি ভয়ানক অভিজ্ঞতা পেতে চলেছে সে তার অনভিজ্ঞ কৈশোরের আরম্ভে।

বাড়ীতে ঢুকবার মুখে, হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে পিতা বললেন স্বর নীচু করে—'ঘরে দারোগা এসে বসে আছে। থানার বড়বাবু তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

চমকে উঠল মাতঙ্গ। থানায়?

'কারো সঙ্গে মারপিট, ঝগড়া কিছু করেছিস নাকি?' উৎকণ্ঠা-বিকৃত কণ্ঠ শিবনাথের।

'কই, না তো, বাবা! ,আমি তো এইমাত্র ইস্কুল থেকে ফিরছি!'

'এতবার জিজ্ঞেসা করলাম দারোগাকে—কেন বড়বাবু ডাকছেন আমার ছেলেকে, কিছুতেই বলল না। কেবলই বলছে—আমি জানি নে।'

'আমি বুড়ো শিবতলায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো? দারোগা চলে গেলে, তারপরে আসবো?'

'কোন লাভ হবে না। ও বসে অপেক্ষা করবে ঠায় যতক্ষণ না ফিরবি। আমরা যে বলেছি—একটু পরেই ফিরবি তুই।'

'তাহলে, চলো, যাই দারোগার কাছে।' বলে স্কুলের বই খাতা শুদ্ধই ঘরে গিয়ে ঢুকলো মাতঙ্গ। দারোগা মোড়ায় বসে, পায়ের ওপর পা রেখে—চুরুট ফুঁকছিলেন। মাতঙ্গ গিয়ে তাঁকে শুধালো—'আমায় ডেকেছেন আপনি?'

পুরু লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি ফেলে একবার মাতঙ্গকে দেখে নিয়ে দারোগা ঠোঁটে চুরুট রেখেই জবাব দিলেন—'না, আমি মাতঙ্গ হালদারকে চাই। থানার ও. সি. তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ভদ্রলোক এখনও ফেরেন নি? ওঁর বাবা যে বললেন—মাতঙ্গবাবু একটু পরেই ফিরবেন।'

'মাতঙ্গবাবু!' খিলখিল করে হেসে উঠল ছেলেটা এবার। মাতঙ্গ তো আমার নাম। আমি আবার বাবু হলাম কবে?'

'চপ্' ধমক দিয়ে উঠলেন দারোগা, 'খিক্ খিক্ করে হাসছিস যে বড়? পুলিশের সঙ্গে ফক্কুরি হচ্ছে?'

শিবনাথ সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, 'না, না দারোগাবাবু, ও ফক্কুরি করতে যাবে কেন আপনার সঙ্গে—ও একেবারে ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে আপনাকে দেখে। কিন্তু ছেলেমানুষ তো, তাই আর কি—'

'অ, ছেলেমানুষ! তাই বলে।' এতক্ষণে বোধহয় বোধোদয় হল সাব ইন্‌স্পেক্টর-এর। মাতঙ্গ আসলে ছেলেমানুষ! কিন্তু ছেলেটার দিকে মুখ ঘোরাতেই আবার তাঁর পুলিশি-প্রেষ্টিজ গাঁক গাঁক

করে উঠল—'এই হতভাগা, আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস যে বড়? দারোগাকে ভয় করে না?'

'না, আমি দেখছিলাম' শান্ত স্বরে জানালো।

'কি দেখছিলি? আমি কি একটা দেখবার জিনিষ? বলি—আমি কি চিড়িয়াখানার বাঘ অথবা ভালুক যে, আপনার ছেলে আমাকে কেবল ড্যাব ড্যাব করে দেখবে?' চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন দারোগা। শিবনাথ তাড়াতাড়ি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কথা বেরুবার আগেই মাতঙ্গ অনুত্তেজিত স্বরে উত্তর দিল—'আমি দেখছিলাম দারোগাবাবু, আপনার হাতের বিড়িটা কত মোটা। এমন মোটা বিড়ি আমি জীবনে দেখিনি।'

'হোয়াট? বিড়ি? হুঁদে দারোগা জনার্দ্দন জোয়ারদার খাবে বিড়ি? রাস্কেল, চুরুট চিনিস না? হাভানা চুরুট। চল্, যাচ্ছিস তো থানায় আমার সঙ্গে, ওখানে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেবো—এটা বিড়ি না অন্যকিছু, থার্ড ডিগ্রীতে ঢুকিয়ে—'

'আপনি ওর ওপর অযথা রাগ করছেন দারোগা সাহেব। ও সত্যিই কখনো চুরুট ছ্যাখে নি। গাঁয়ে থাকে, এখানে চুরুট তো কেউ খায় না!'

'তাই বলে দারোগার মুখের ওপর কথা বলবে চোখ তুলে? এ অসুখের দাওয়াই আমাদের খুব জানা আছে, হালদার মশাই!' এই বলে, তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঝাঁ করে মাতঙ্গের একটা হাত ধরে প্রচণ্ড হেঁচকা মেরে চিৎকার করে উঠলেন হুঁদে দারোগা—'চল্ স্কাউণ্ড্রেল গিনিপিগ, তোকে আজ ডিসেক্ট করবো থানায় নিয়ে গিয়ে।'

বাড়ীর মধ্যে ততক্ষণে মা, ভাই-বোনদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। আশপাশের বাড়ী থেকে আত্মীয় বন্ধুরা এসে দাঁড়িয়েছে

রাস্তায়। সকলের দৃষ্টিতেই আতঙ্কের ছায়া। কী করবে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে—কে জানে!

বড় দারোগা, অর্থাৎ বড়বাবু সত্যি সত্যিই বড় সব দিক থেকেই। ছয় ফুট মাথায়, কোমর এবং পেটের বেড় চার ফুট, হস্ত ও চরণে মস্ত গদার গড়ন। এক একটি দাঁত যেন এক ইঞ্চি মাপের ঝিনুক। অল্প বয়সে নাকি বক্সিং করতেন। নাকের মাঝখানটা তাই ভেঙ্গে বসে গেছে ভেতর দিকে। নাকের ডগাটা একটা বর্তুলাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত। সেই নাকের ডগায় আবার এক বিরাট আঁচিল—কুচকুচে কালো। আর, সেই আঁচিলের ওপর এক গোছা খাড়া চুল। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একটা দশাসই চেহারা আর কি।

খাকি হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট, খাকি মোজা আর ব্রাউন বুট পরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ও. সি. তুঙ্গনাথ চট্টরাজ তাঁর ঘরে—গোয়েন্দা বিভাগের পাঠানো রিপোর্টের ফাইলটা সামনে খুলে। সাংঘাতিক রিপোর্ট। শিবরামপুরের হালদার বাড়ীর সন্তান মাতঙ্গ হালদার ছয় ছয়বার জেল থেকে ঘুরে আসা নরেন বৈরাগীর সঙ্গে গোপনে কি সব দেওয়া-নেওয়া করছে। মহেশতলার স্কুলের কোয়েশ্চনেবল কার্যাকৃটার অবিনাশ মাষ্টারেরও খুব অনুরক্ত ঐ মাতঙ্গ। কিন্তু মাতঙ্গের বয়সটা যে কত, আর পেশাতে সে যে কি—সেটাই লেখে নি এই রিপোর্টে। এইসব গোয়েন্দাগুলো কি অফিম খায়? তাই কি নেশায় বুঁদ হয়ে ভুলে গেছে এই ভাইটাল্ পয়েণ্টগুলো উল্লেখ করতে। তবে, হ্যাঁ। তেরো তেরোটি বছর ও. সি. গিরি করে আসছেন তো তুঙ্গনাথ! তাই, কেবল নাম শুনেই তিনি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারেন—নামধারীর চেহারা কেমন, কত বয়েস, কি সে করে!

এই ধরাই যাক না তাঁর নিজের নামটা। তাঁর নাম—তুঙ্গনাথ। তুঙ্গনাথটা কি? গাড়োয়ালের একটা পাহাড়ের চূড়োর নাম। এখন মিলটা নিজেরাই মিলিয়ে নাও। শরীরটা তাঁর পাহাড়ের মত কিনা

—একবার বিবেচনা করে ছাখো! তেমনি এক্ষেত্রে—যাকে জনার্দ্দন গেছে ধরে আনতে, তার নাম মাতঙ্গ। মাতঙ্গ কাকে বলে? হাতীকে। তবে? তবে তো ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, যে ক্রিমিন্যালটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে জোয়ার্দ্দার—তার চেহারাটা হবে একটা হাতীর মত, শক্তিও হবে হাতীর মত, আর স্বভাবেও হবে নির্ঘাৎ ঐ হাতীর মতই মারাত্মক। তা তো হবেই। নইলে কি এমনি মেশামেশি করছে মাতঙ্গ টেরোরিষ্টদের সঙ্গে? কিন্তু, এমন ভয়াবহ একটা ক্রিমিন্যালকে ধরে আনা হচ্ছে, সেরকম Preparation কোথায়? প্রস্তুতি? এই, হাজত-ড়িউটি কিস্কো হ্যায়?

একটি ডিগডিগে রোগা চেহারার কন্‌ষ্টেবল এসে ডান পা বাঁ পায়ে ঠুকে স্যালুট জানালো। আর্ত্ত চিৎকার করে উঠলেন তুঙ্গনাথ—'হাজত ডিউটিমে তুম্ হ্যায়? সর্ব্বনাশ। মাতঙ্গ আতা হ্যায় মালুম হ্যায়?,

'নেহি হুজুর। মাতঙ্গ সাব কৌন হোবে? ডিস্‌পি সাব, কেয়া ইসডিপি সাব?'

ধমকে বললেন ও. সি.—'মাতঙ্গ কোন ডি. এস. পি অথবা এস. ডি. পি. ও-র নাম নয় রে বুরবক। মাতঙ্গ এক খাতরনাক স্বদেশী-ওয়ালা। হাতীর মত চেহারা। তুমকো খটমলের মত আঙ্গুলে টিপে খতম্ কর্ দেগা, সম্‌ঝা?'

'জী হুজুর।' প্যাঁকাটির মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়-কম্পিত স্বরে জবাব দিল হাজত-ডিউটি, 'আব কেয়া হোগা হুজুর! আপ তো পেহলবান হ্যায়, আপ হাম্‌কো বাঁচায়েঙ্গে।'

'ওঃ, আমায় কৌন বাঁচায় তারই ঠিক নেহি হ্যায়, হাম তুম্‌কো বাঁচায় গা? যাও ছোটবাবু কো রাইফেল বের করনে বলো, জলদি!'

পড়ি কি মরি করে হাজত-ডিউটি দৌড়লো থানার সেকেণ্ড অফিসারের সন্ধানে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেকেণ্ড অফিসার তৈরী

হয়ে এলেন। হাতে রাইফেল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে শুধালেন— ‘কাকে ধরে নিয়ে আসছে জনার্দ্দনবাবু, স্যার ?,

গম্ভীর স্বরে ও. সি. জানালেন—‘মাতঙ্গ হালদার। এ গ্রেট টেররিষ্ট। এই ছ্যাখো, গোয়েন্দা রিপোর্ট। কি মারাত্মক রিপোর্ট। ছয়বার জেল ঘুরে আসা এক বৈরাগীর সঙ্গে রাত-দিন লেন-দেন চলছে তার। মহেশতলা স্কুলের বিপ্লবী যুবক মাষ্টার অবিনাশ তার নিত্যসঙ্গী। এর ওপর কড়া নজর রয়েছে গোয়েন্দাদের।’

‘কত বয়েস, স্যার ?’

‘এই খানেই তো গলতি করেছে গোয়েন্দারা! বয়েসটা লিখতে গেছে ভুলে। কেবল লিখেছে সান অফ শিবনাথ হালদার অফ ভিলেজ শিবরামপুর। কিন্তু, সে যাই হোক, আমাদের তো প্রস্তুত থাকতেই হবে। মাতঙ্গ যার নাম, তার চেহারাও নিশ্চয় মাতঙ্গ অর্থাৎ হাতীর মতই হবে। ঐ খ্যাংরা কাঠির মত প্যাঙা হাজত ডিউটিকে সেই সাংঘাতিক টেররিষ্টটা যখন বার দুই শূন্যে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ঐ রাস্তায়, তখন তাকে বাঁচাবে কে ?

‘চিন্তার কথা, বড়বাবু।’ ছোটবাবুর উৎসাহ বেশ কিছুটা নিভু নিভু।

‘চিন্তার কথা বলেই তো আপনাকে তৈরী থাকতে বলেছি রাইফেল নিয়ে। আরও তিনজন সেপাইকে রেডি রাখুন প্লেন ড্রেসে। আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা, দেশকে উদ্ধার করার নাম করে আমাদের লাইফগুলোকে মিজারেবল করে দিল এরা!’

‘মাতঙ্গকে কি অ্যারেস্ট করবেন, স্যার ?’ সেকেণ্ড অফিসারের প্রশ্ন।

‘তেমন কোন অর্ডার এখনো আসে নি। ওরা লিখেছে— মাতঙ্গকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস-জাজ্ঞাস করতে, ওকে সাবধান করে দিতে। তা, যদি বেশি হম্বি তম্বি করে, দুই-চার ঘা দিতে হবে বৈকি। আপনি কি বলেন ?’

একটু ইতস্ততঃ করে ছোটবাবু বললেন—'এমনটি করা কি ঠিক হবে, স্যার ? এরপর আমাকে-আপনাকে রাস্তায় বেরুতে হবে। এই সব স্বদেশীওয়ালারা ভয়ানক প্রতিশোধ নেয়। তার চেয়ে, ওকে জেরা করার জন্যে গোয়েন্দাদের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক হবে বোধ হয়।'

এই সময় একজন এল্. সি. লিটারেট কনষ্টেবল এসে জানালো—জনার্দ্দন জোয়ার্দ্দারের আগমন-বার্তা। 'এসে গেছে ?' ভয়ঙ্কর রকম উত্তেজিত হয়ে দুইমণি দেহটি নিয়ে চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে আবার ধপাস করে বসে পড়লেন তুঙ্গনাথ চট্টরাজ। মুহূর্ত্তে সারা থানায় কেবল একটি শব্দেরই গুঞ্জন মর্মরিত হতে শোনা গেল। 'এসে গেছে, এসে গেছে,' আর, বলাই বাহুল্য চক্ষের নিমেষে দেখা গেল—থানার ও. সি.-র কক্ষে একমাত্র ও. সি. ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী বলতে আর কেউ নেই কোথাও। কোথায় হাজত-ডিউটি, কোথায় সেকেণ্ড অফিসার, আর কোথায় বা সেই প্লেন ড্রেসের সেপাইরা।

হুড়মুড় করে সুইং ডোর ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলেন জনার্দ্দন। ঢুকেই বুট ঠুকে স্যালুট।

'ধরে এনেছি, স্যার।'

'কাকে ? মাতঙ্গকে ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'কোথায় সে ?'

'সুইং ডোরের ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে। আনবো স্যার ভেতরে ?

'হাজত-ডিউটি, সেকেণ্ড অফিসার কোথায় ?'

'আজ্ঞে, তা তো জানি নে !'

ভেংচি কেটে বলে উঠলেন তুঙ্গনাথ—'তা তো জানি নে ! না জানলে চলবে ? মাতঙ্গ এসে গেছে না ?'

'আজ্ঞে তা তো এসে গেছেই, তার জন্যে আর ভাবনা কি ?

'ভাবনা নেই ? বলছেন কি জনার্দ্দন বাবু ? একটা সাংঘাতিক

টেরোরিষ্টকে ধরে আনলেন, বলছেন—ভাবনার কিছু নেই ?

বলতে বলতে দেখা গেল মাতঙ্গ নিজেই সুইং ডোর ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসছে। ও. সি. গর্জে উঠলেন, 'একি একি, আমাদের এই মরণ-বাঁচন মুহূর্ত্তে কোথা থেকে এসে জুটলো এই পুচকে ছোঁড়াটা। কে একে ঢুকতে দিয়েছে থানাতে ?'

'আমি স্যার !' জনার্দ্দন বুক ফুলিয়ে বললেন, আমি তো ওকেই ধরে নিয়ে এসেছি শিবরামপুর থেকে। ওর নামই তো—

'আরে ওর নাম নিয়ে আমি কি ধুয়ে খাবো ? ও. সি. খিঁচিরে উঠলেন, ও দিকে ঘরের বাইরে যে এসে বসে আছে মাতঙ্গ, আমাদের যম।'

'আমার নামই তো মাতঙ্গ দারোগাবাবু!' একেবারে টেবিলের পাশটিতে এসে বলল মাতঙ্গ।

'হোয়াট ? আমার সঙ্গে ইয়ারকি করা হচ্ছে ?' চট্টরাজের প্রায় ক্ষাপ্পা হওয়ার অবস্থা।

'হ্যাঁ স্যার! এই মাতঙ্গ বটে, এই মাতঙ্গ হালদার।' জনার্দ্দন নিবেদন করলেন। 'তার মানে!' বলে আর একবার চিৎকার করতে গিয়ে হঠাৎ ঝপ করে স্বরকে একেবারে খাদে নামিয়ে এনে, প্রায় ফিস ফিস করে বললেন, 'আপনি ভুল করেন নি তো ? মাতঙ্গ হালদার, মানে সান অফ—শিবনাথ হালদার অফ ভিলেজ শিবরামপুর।' বাক্যটি পূর্ণ করে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন জনার্দ্দন।

সুইং ডোরের ওপারেও এতক্ষণ স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। হাজত-ডিউটির ডিউটিতে প্রত্যাবর্ত্তনই তার প্রমাণ। সেকেণ্ড অফিসারও রাইফেল হাতে এরই মধ্যে এসে নিশ্চিন্ত মনে আসন গ্রহণ করেছেন ও, সি.-র কামরায়।

'এই ছোঁড়া!' এতক্ষণের উত্তেজনা ও দাপাদাপিতে যে গোঁফ-জোড়া ঝুলে পড়েছিল প্রায় ঠোঁটের ওপরে, সে দুটোকে মোড়ে দিয়ে আবার ওপর মুখী করতে করতে বড়বাবু ডাকলেন মাতঙ্গকে।

মাতঙ্গের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ রাইফেটলার ওপরে।

সরস্থনার পালবাবু বলেছিলেন—পুলিশ আর মিলিটারীরা বন্দুক ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে রাইফেল। তবে কি ইউনিফর্ম পরে চেয়ারের ওপর বসে থাকা ঐ লোকটার হাতে যেটা দেখা যাচ্ছে—সেটাই সেই রাইফেল, যে রাইফেল সম্বন্ধে বিষদ সব জানবার জন্যে কতই না ইচ্ছা তার মনে!

কোন উত্তর না পেয়ে, আর এক ধাপ গলা চড়ালেন ও. সি.—'এই, ছোঁড়া! ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস নে।

'দাঁড়াও না. আগে এটা ভাল করে দেখে নি।' মাতঙ্গ এগিয়ে গিয়ে রাইফেলে একবার হাত বুলোবার চেষ্টা করতেই সেকেণ্ড অফিসার বাঁ হাত থেকে রাইফেলটাকে সরিয়ে নিলেন ডান হাতে।

'এটা বুঝি রাইফেল?'

সবিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন দুই দারোগা কচি বাচ্চার প্রশ্ন শুনে।

'লিয়েনফিল্ড, না, রস।'

রাইফেল-এর জাতের খোঁজ নিচ্ছে মাতঙ্গ।

'রস আর লিয়েনফিল্ড-এর তফাৎ জানিস?' ছোটবাবুর প্রশ্ন।

'কেমন করে জানবো, আমি কি দেখেছি চোখে কখনো? তবে শুনেছি, লিয়েনফিল্ডে ক্লাই থাকে, রস-এ থাকে না।' একটু থেমে, ভাল করে আবার রাইফেল-এর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিক্ করে একবার হাসল মাতঙ্গ।

'এই, এই, হাসছিস যে বড়?' বড়বাবুর বিস্ময় ক্রমেই বর্দ্ধমান। এ ঘরে যারা ঢোকে, ভয়ে হাউমাউ করে কাঁদে সেই ক্রিমিন্যালরা। আর নাক টিপলে দুধ বেরোয় যে ছেলেটার. সে কিনা তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে? রাইফেল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে?

'বাঃ, হাসবো না? ও দারোগাবাবু, আপনার রাইফেলে ম্যাগাজিন-বক্স কই?' ছোটবাবু ঝগড়ার সুরে বলে উঠলেন কোথায় আবার?

তোর ঐ গোবর-ভরা মাথায়। এ-রাইফেলে আবার ম্যাগাজিন-বক্স থাকে নাকি?

'কে জানে বাবা, তবে বোধহয় আমিই ভুল শুনেছি।'

হঠাৎ গোয়েন্দা বুদ্ধি টগবগ করে উঠল তুঙ্গনাথের মগজে। এই সুযোগ। এই সুযোগ জেনে নেবার—কে এই দুধের শিশুপ্রায় একটা বাচ্চার কানে রাইফেলের মন্ত্র শোনায়? একটু নরম গলায় এবার কথা বললেন বড়বাবু—'কার কাছে শুনেছিস র্যা—রাইফেলের কথা?'

মাতঙ্গ কিন্তু সেকেণ্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলে চলল—'আমি শুনেছি, রাইফেলের ম্যাগাজিনে থাকে দশটা গুলী, আর চেম্বারে একটা। এই মোট এগারোটা। তা আপনারটাতে দেখছি ম্যাগাজিন বক্সই নেই। এ আবার কেমন রাইফেল?'

'পুলিশের রাইফেলে কেবল একটা করে গুলী ভরা যায় বোল্ট করে। ও সব ম্যাগাজিন-বক্সটক্স থাকে না এ রাইফেলে, বুঝলি।'

'কই, চেম্বারটা একবার দেখান না গো দারোগাবাবু—' আব্দার জুড়ে দিল মাতঙ্গ। ভয়ঙ্কর রাগে ফেটে পড়তে গিয়ে থমকে থেমে গেলেন ছোটবাবু। বড়বাবু একটা ছোট স্লিপ এগিয়ে ধরেছেন তাঁর সামনে হাত প্রসারিত করে। ভাঁজ করা স্লিপটা খুলে পড়ে, একেবারে অন্যমানুষ বনে গেলেন যেন সেকেণ্ড অফিসার। স্লিপে লেখা—'খুব আপনজনের মত ব্যবহার করো ছেলেটার সঙ্গে, খুব দহরম মহরম। ওর পেটের কথা বের করতে হবে। কার কাছে ও রাইফেলের এত খোঁজ খবর পায়, কেন ওকে দেওয়া হয় এত খোঁজ-খবর। একটু মিষ্টি ব্যবহার করলেই হয়তো একেবারে রিং লিডারের সংবাদটিই পেয়ে যাবো আমরা।'

স্লিপটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, একগাল হেসে ছোটবাবু ডাকলেন মাতঙ্গকে কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বুঝি খুব বন্দুক, রাইফেল দেখতে ভালবাসো?'

'হ্যাঁ তো, তা কই, আপনি তো আমায় চেম্বারটা দেখালেন না।' একেবারে রাইফেলের ওপর হাত রেখে মাতঙ্গ শুধালো।

'দেখাবো, দেখাবো, নিশ্চয়ই দেখাবো। কিন্তু তার আগে বলো তো খোকা, বন্দুক-রাইফেলের কথা কার কাছ থেকে জানতে পেরেছো তুমি?'

এতক্ষণ ঘরের একপাশে নীরবেই দাঁড়িয়েছিলেন এস. আই. জোয়ার্দ্দার। তিনি এবার কথা কইলেন—ভারী sharp আর intelligent ছেলে, বড়বাবু। এক মুহূর্তে পরকে আপন করার শক্তি অসাধারণ।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারের হদিস কিছু পেয়েছো কি না! গ্যাং-টা আসলে কার? অবিনাশের, না নরেন বৈরাগীর?' বড়বাবু আসলে ব্যাপারের বাইরে যেতে রাজী নন। হাতে তাঁর আই. বি. রিপোর্ট জ্বল জ্বল করছে।

আমতা আমতা করে জবাব দিলেন জোয়ার্দ্দার—'না, স্যার, তেমন কিছু তো......'; 'তা কেন পাবে? যাকে ধরে আনবে, তার নামে ইয়া ইয়া সার্টিফিকেট ছাড়বে কেবল।' বলি, পুলিশের চাকরি করতে এসছো, না, বৈষ্ণব মঠে বাবাজী হতে এসেছো?' বড়বাবুর মেজাজ ভাল নয় বুঝে জনার্দন তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। ওদিকে গদ গদ হয়ে, বড়বাবুর শ্লিপের নির্দেশ পালন করে চলেছেন তখনও সেকেণ্ড অফিসার। ছেলেটাকে হাত না করতে পারলে পেটের কথা বেরুবে কেন? তাই, রাইফেলের বোল্ট টেনে ভেতরের কার্টিজটা পুরে দেখালেন তিনি। মাতঙ্গ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল—'বা, গুলী ভরাই আছে! তা, সেফটি ক্যাচটা কই?' ঘরের মধ্যেকার দুই দারোগাই পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলেন সবিস্ময়ে। একরত্তি ছেলে, বন্দুকের সেফটি ক্যাচের খবরও তবে সে রাখে? মারাত্মক কোন টেররিষ্টের সঙ্গে যোগাযোগ যে এর আছে, সে বিষয়ে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিলেন ও. সি.। তাছাড়া রিপোর্টে তো স্পষ্টই

লেখা আছে বৈরাগী আর অবিনাশ মাষ্টারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতার কথা।

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পারো?' প্রশ্ন করলেন ও. সি. সামনের দিকে একটু ঝুঁকে?

সাধুবাবার সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল মাতঙ্গের। বন্দুক, পিস্তলের কথা কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলেন তিনি প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই।

'না,' উত্তর দিল ছেলেটা, 'বন্দুক পাবো কোথায় যে ছোঁড়া শিখবো। আপনি আমায় শিখিয়ে দেবেন?'

'দেবো, দেবো, নিশ্চয় শিখিয়ে দেবো।' সেকেণ্ড অফিসারের কণ্ঠের গদগদ ভাবটা তখনো যায় নি, 'তা, বাবা, এত রাইফেল বন্দুকের ওপর ঝোঁক কেন তোমার বল তো?'

'বড় হয়ে লড়াই করতে হবে না?'

'লড়াই?' টেবিলের ওপর হাত চাপড়ে বলে উঠলেন ও. সি. 'লড়াই কার বিরুদ্ধে?'

'ঐ যারা আমার বাবার মত সৎ আর মহৎ মানুষকে গরীব ভিখারী করে রেখেছে।'

'তারা কারা?' বড়বাবু বেশ উত্তেজিত। ফাঁদের কাছাকাছি এসে পড়েছে মনে হয় শিকারটা।

'ও, তাও বুঝি জানেন না? ঐ সাদা চামড়ার সাহেবরা। ঐ সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করবো বন্দুক দিয়ে, বড় হয়ে। এ দেশ থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বো ওদের।'

'বলছো কি? ইংরেজদের সংগে লড়াই করবে? তবে তো তুমি মস্ত জোয়ান?' ও. সি.-র স্বর আরও মিঠে, আরও নরম, 'তা, বন্দুক ছোঁড়া শিখছ কার কাছ থেকে? 'কোথায় আর শিখলাম, একটা রাইফেলই পাচ্ছি না। আমায় আপনি রাইফেল ছোঁড়া শিখিয়ে দেবেন দারোগাবাবু?'

'নিশ্চয় শেখাবো, নিশ্চয় শেখাবো!' তুঙ্গনাথ বিগলিত ভাব দেখালেন, 'ছোটবাবু!' সেকেণ্ড অফিসার তাকালেন বড়বাবুর দিকে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাঁ চোখটা একবার টিপে, গোঁফের দুই প্রান্তে মোচড় দিতে দিতে—ও. সি. বললেন—'সেফটি ক্যাচটা ভালভাবে দেখে নিয়ে, ওর হাতে রাইফেলটা একবার দিন তো!'

একটু ইতস্ততঃ করলেন সেকেণ্ড অফিসার। বন্দুকটা অনভিজ্ঞ বাচ্চার হাতে তুলে দেওয়া কি ঠিক হবে? চেম্বারে গুলি ভরা আছে! কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন তাগিদ এলো বড়বাবুর কাছ থেকে, উনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। বন্দুকটা বাড়িয়ে দিলেন ছেলেটার দিকে। মাতঙ্গ প্রায় ছোঁ মেরে ছোটবাবুর হাত থেকে রাইফেলটা কেড়েই নিল একরকম। তারপর, কাঁধের কাছে 'বাটটা' রেখে ট্রিগারে আঙ্গুল দিয়ে শুধালো, মিলিটারী রাইফেল-এ তো ট্রিগারে ফার্ষ্ট প্রেসার, সেকেণ্ড প্রেসার জানতে হয়. পুলিশ রাইফেল-এও কি ঐ একই নিয়ম, দারোগাবাবু?

ছোটবাবুর চোখগুলো আর ছোট থাকতে পারলো না। এ বাচ্চাটা ফার্ষ্ট প্রেসার সেকেণ্ড প্রেসারের ব্যাপারটা জানলো কোথা থেকে। তাজ্জব কাণ্ড। বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তিনি তাকালেন একবার ও. সি.-র দিকে। আর তখনই তুঙ্গনাথ আর একবার নিজের বাঁ চোখটা মট্‌কে, মাতঙ্গের কাছে জানতে চাইলেন, 'যে কখনো রাইফেল চোখেই ছাখে নি, সে ফার্ষ্ট প্রেসার সেকেণ্ড প্রেসারের কথা জানতে পারে কি?

'হ্যাঁ, খুব পারে।'

'কেমন করে পারে?'

'কেউ যদি বলে দেয়, তাহলেই পারে।'

'তোমাকে তবে কেউ নিশ্চয় বলে দিয়েছে!'

'বাঃ, না বললে, আমি জানবো কোথা থেকে?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' তরী বোধহয় তীরে এসে গেছে

ও. সি.-র অন্ততঃ কথার সুরে তাঁর তেমনটিই মনে হয়। পুনশ্চ জানতে চাইলেন তিনি—তা, বাবা মাতঙ্গ!

'আজ্ঞে—'

'ফার্ষ্ট প্রেসার সেকেণ্ড প্রেসারের কথা তোমায় কে বলেছে বাবা? বৈরাগী?' চমকে উঠল বালকের কান। এরা বৈরাগীকে চেনে তাহলে? তাড়াতাড়ি জবাব দিল মাতঙ্গ—কে বৈরাগী—তাকে আমি চিনিই না।' 'তবে কি অবিনাশ মাষ্টার?'

আশ্চার্য্য! অবিনাশবাবুকেও···

'না, না, উনি কেমন করে জানবেন বন্দুকের কথা? উনি যে আমাদের ইস্কুলে পড়ান!' 'তবে কার কাছে রাইফেল সম্বন্ধে এত কিছু শুনেছ তুমি?'

'ও সরস্থনার এক ভদ্রলোক, খুব নাম করা শিকারী।'

'সরস্থনার?' বড়বাবু এবং ছোটবাবু দ্বৈত কণ্ঠে একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কে? সুরেশ পাল?'

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মাতঙ্গ। এরা কি সবাইকেই চেনে এই ছুনিয়ার? সাধুবাবা, মাষ্টার মশাই, সুরেশ চন্দ্র পাল—কারুরই নাম অজানা নয় এদের কাছে? এরা কি তবে ঐ সাদা শয়তানের দলেরই লোক? যাদের এদেশ ছাড়া করার স্বপ্ন দেখছেন সাধুবাবা, মাষ্টারমশাই আর সুরেশদা?

ঠিক এই সময়, থানার বাইরে বেশ কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। একটি পরিচিত কণ্ঠের চিৎকারও শোনা গেল স্পষ্ট —'আমি মদের দোকানে পিকেটিং করেছি, তোমরা আমায় অ্যারেষ্ট করতে পারো, মাথা ফাটিয়ে দিলে কেন? সাহেবদের গোলামি আর মোসায়েবি করতে করতে এখন কি তোমরাই লাটসাহেব হয়ে গেছ? যা খুশি তাই করবে? তোমাদের রক্তের দাম আছে, আমাদের রক্তের দাম নেই। বলতে বলতে যে লোকটি এক ধাক্কায় সুইং ডোর ফাঁক করে বড় দারোগার ঘরে এসে ঢুকলেন, তাঁর অবস্থা দেখে মুহূর্তে দুই

চোখে জল এসে পড়লো মাতঙ্গের। কপাল, মুখ, জামা, কাপড় লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সার্টের পেছন দিকটা ছেঁড়া। সার্টের আস্তিন দিয়ে চোখের উপরে গড়িয়ে পড়া রক্তস্রোতকে রুখবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে যিনি বলছিলেন কথাগুলো, ঘরে ঢুকেই তিনি কিন্তু অবাক। কিন্তু তা এক পলকের জন্যেই। পরমুহূর্তেই সারা ঘর কাঁপিয়ে গর্জে উঠলেন তিনি—তোমাদের লজ্জা হয় না? একটা দুধের বাচ্চাকে থানায় টেনে নিয়ে এসেছো ওর মায়ের কোল থেকে?

'মাষ্টার মশাই!' ডুকরে প্রায় কেঁদে উঠল মাতঙ্গ, কে? কে আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে বলুন। আমি এখনই এই বন্দুক দিয়ে তাকে—' বলার সঙ্গে সঙ্গেই, রাইফেলটা ঝাঁ করে তুলে, থুতুনী, বুক আর দুই হাতের চেটোর মধ্যে ধরে, বড়বাবুর দিকে লক্ষ্য স্থির করে, চিৎকার করে উঠল—'কে মেরেছে মাষ্টার মশাই এর মাথায়, বলো।' তুঙ্গনাথ দুঃস্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি—একটা পঁচকে ছোঁড়ার খপ্পরে পড়ে তাঁর অমূল্য জীবন-ধন এমনিভাবে অকালে—'

'কই বললে না? আমি সেফটি ক্যাচ খুলে দিয়েছি কিন্তু। এইবার ট্রিগার টিপলে······বলো শিগগির।

'অ্যাঁ? সেফটি ক্যাচ খুলে দিয়েছে যে ছোটবাবু।'

আর ছোটবাবু! ছোটবাবু ততক্ষণে সারেণ্ডারের ঢং-এ দুই হাত মাথার ওপর তুলে থর থর করে কাঁপছেন।

ট্রিগারে যখন হাত দিয়েছে তখন আর টিপতে কতক্ষণ। রাইফেলের নলটা এখন বড়বাবুর দিকে করা আছে, সেটাই বা ঘুরতে কতক্ষণ! তারচেয়ে উর্দ্ধবাহু ঋষি হয়েই বসে থাকা বোধহয় অনেক বেশী নিরাপদ।

ছেলেটা চিৎকার করে উঠল আবার—'মাষ্টারমশাই, রেডি! গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ছুটে বেরিয়ে যাবেন, আমিও পালাবো।'

কথা শেষ হবার আগেই, ভেন্টিলেটরের দিকে তাক করে গুলী ছুঁড়লো মাতঙ্গ। রাইফেলের প্রচণ্ড আওয়াজ, ভেন্টিলেটরের কাঁচ ভেঙ্গে পড়ার খন্ খন্ শব্দ, মুহূর্তে অপ্রস্তুত থানাকে যেন হতবাক করে দিল একেবারে।

ধোঁয়ার দাপট কিছুটা কমে এলে, বীরপুঙ্গব হাজত-ডিউটি এসে উঁকি মারলো একবার ও. সি. র ঘরে। দেখলো, পর্বত প্রমাণ দেহ নিয়ে, নিজের দুই হাতে প্রাণপণে নিজের মাথাটাকে চেপে ধরে টেবিলে মুখ গুঁজে বসে আছেন মহামান্য বড়বাবু, আর ছোটবাবু, তখনও শূন্যে দুই হাত তুলে নিমীলিত নয়ন। রাইফেলটা পড়ে আছে অদূরে, মেঝেতে।

ছেলেকে যখন দারোগা এসে ডেকে নিয়ে গেল বিকালে, তখনই শিবনাথ যেতে চেয়েছিলেন থানায়। কিন্তু বৃদ্ধ স্বজন বন্ধুরা মানা করেছিলেন। বলেছিলেন—ঐ বাচ্চাকে নিয়ে পুলিশ আর কি করবে। দুইচার কথা জিজ্ঞাসা করে হয়তো ছেড়ে দেবে। কিন্তু শিবনাথ বাবুকে থানায় পেলে, ওরা হয়তো তাঁকে অনেক হেনস্ত করতে পারে। পুলিশকে কি বিশ্বাস আছে? কথায় বলে না—বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা?

তাই, কনিষ্ঠপুত্রকে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর বুকের ভেতরটা বার বার মোচড় দিয়ে ওঠা সত্ত্বেও, শিবনাথ ঘরেই অপেক্ষা করেছিলেন কয়েক ঘণ্টা কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে যেতেও ছেলেটা যখন ফিরলো না, তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। রান্নাঘরের দিকটায় কান্নাকাটি সেই যে শুরু হয়েছিল, এখনও চলছেই। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে চারদিকে। একটা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লেন শিবনাথ গ্রামের পথে। ছেলেটার লেখাপড়ায় মন নেই সত্যি, কিন্তু গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, খেলাধূলোয় ওর জুড়ি পাওয়া

বেশ কঠিন। ছোট্ট একটা মাটির লক্ষ্মীর বাক্স কিনেছে মেলাতে। তাতে দুটো করে টিফিনের পয়সা ফেলে রোজ। বড় হয়ে সপ্তডিঙা কিনবে ঐ পয়সায়। তার পর, সেই সপ্তডিঙাতে চড়ে একদিন বেরিয়ে পড়বে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। বিদেশ থেকে হাজার হাজার টাকা এনে তুলে দেবে নাকি শিবনাথের হাতে তাঁর আর্থিক দৈন্য ঘুচাতে। ভাবতে ভাবতে গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু। আরও তো দুটি পুত্র তাঁর আছে—আনন্দ আর সুশান্ত। কিন্তু কই, তারাতো কোন দিন তাঁর অভাব অনটন দূর করার কথা চিন্তাতেও আনে না একবার। অথচ, বাড়ীর সবচেয়ে ছোট হয়েও, মাতঙ্গ সেই আট বছর বয়স থেকেই বাপ-মায়ের দুঃখের কথা ভাবে······ভয়ঙ্কর শক্তিশালী টর্চ্চের আলো এসে দুই চোখকে অন্ধ করে দেবার জোগাড় করলে শিবনাথের। শিবনাথ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন দারোগা এবং তিনজন কন্‌ষ্ঠেবল পরক্ষণেই এসে ঘিরে ফেলল তাঁকে।

'কে তুই ?'

'শিবনাথ হালদার।'

'কোন গাঁয়ের লোক ?'

'আজ্ঞে, শিবরামপুর ?'

'শিবরামপুরের হালদার ? তুমিই কি তবে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীমান মাতঙ্গের বাবা—'

'অ!' দারোগাবাবু কি যেন একটু ভেবে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেসা করলেন আবার, 'তা মশায়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছিল এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ?'

'থানায়।'

'উদ্দেশ্য ?'

'আজ্ঞে আমার ছোট ছেলে ঐ মাতঙ্গকে একজন দারোগাবাবু এসে সেই যে ডেকে নিয়ে গেলেন থানায় বেলা সাড়ে চারটেয়, তা

সে ছেলে তো ফিরলো না এখনও! তাই লণ্ঠন নিয়ে যাত্রা করেছিলাম ঐ থানার দিকেই—' 'তোমার ছেলে থানায় নেই।'

'সে কি? কতক্ষণ বেরিয়েছে সে থানা থেকে দারোগামশাই?'

'আর ন্যাকামি করছো কেন বাপু? রাতের অন্ধকারে কোন বাদাড়ে লুকিয়ে রেখে এলে ছেলেকে, ঠিক করে বলো।'

দারোগার গলার স্বর ক্রমেই কর্কশ হচ্ছে। 'কি বলছেন আপনি। ছেলেকে লুকিয়ে রাখবো? কেন? আমার ঐ দুগ্ধপোষ্য ছেলেটা কি চোর, না ডাকাত?'

'তার চেয়েও মারাত্মক। চলো, আগে বাড়ীটা সার্চ করে আসি।'

গট্ গট্ করে বুটের শব্দ তুলে দারোগা কন্‌ষ্টেবলদের নিয়ে হালদার বাড়ীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাক্স-পেঁটরা ছুড়ে মেঝেতে ফেলে, বালিস বিছানা তছনচ করে, তন্ন তন্ন করে খুঁজলো বাড়ীর আনাচ কানাচ সব জায়গায়। বাড়ীর মেয়েদের সামনে হম্বিতম্বি করে বলে গেল যাবার আগে—টেরোরিষ্ট ছেলেকে ঘরে পুষে রাখলে মরবে নিজেরাই। ছেলেটা ফিরলেই, থানায় নিয়ে যাবে। না হলে, বাড়ীর সব ক'টি পুরুষকে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবো, মনে রেখো। তখন কেউ আসবে না তোমাদের বাঁচাতে এ গাঁয়ে।'

দারোগার কথা শুনে আতঙ্কে কান্না থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন গৃহিণীরা। কেবল, ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন একবার প্রাণদা —'আমার বুকের ধনকে তুমি কোথায় বন্দী করে রেখে এলে গো দারোগাবাবু? তাকে ফিরিয়ে দাও, আমার এই বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে সে ছেলেটার জন্যে!

এক রাত, দুই রাত, তিন রাত চলে গেল—কোন সন্ধান নেই মাতঙ্গের। স্কুলে শিবনাথ খবর নিয়ে জানলেন অবিনাশ মাষ্টার তাঁর

এক ভগ্নীর খুব অসুস্থতার খবর পেয়ে পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে—মানভূম, না সিংভূমের কোন এক গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। কিন্তু মাতঙ্গের খবর দিতে পারলো না কেউই।

প্রাণদা তো আহার নিদ্রা ভুলে গেছেন। কেঁদে কেঁদে দুই চোখ জবাফুল। চব্বিশ ঘন্টা এসে বসে আছেন, বাইরের ঘরের সামনেকার পৈঠের ওপরে—দূরে গ্রামের পথের পানে চেয়ে। বাড়ীর সবচেয়ে দামাল আর সবচেয়ে হৃদয়বান ছেলেটা কোথায় রইল পড়ে, কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে তার ঠিক নেই; পুলিশ তাকে শেষই করে দিল কিনা—তাই বা কে বলতে পারে? এই পুলিশের দলই তো বাচ্চা খুদীরামকে ফাঁসির কাঠে লটকে মেরে ছেড়েছে সেদিন। এরা কি মানুষ? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন প্রাণদা—'ওরে মাতুরে, একবার ফিরে আয় বাবা! একবার খালি চোখের দেখা দিয়ে যা।'

বড় ছেলে আনন্দ, মেজো ছেলে সুশান্ত এসে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিল কতবার, কতবার বলল—'তুমি কিছু না খেলে, আমরাও খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেবো, মা।' কিন্তু মাকে তবু নড়াতে পারলো না তারা ঐ পৈঠের উপর থেকে। শুধু হাহুতাশ বেরিয়ে আসে বুক চিরে প্রাণদার—'মাতু যে আমার আজ তিন দিন না খেয়ে আছে রে! আমি কেমন করে দানা তুলি মুখে।'

নিশুতি রাতে, ঐ পৈঠের ওপর আঁচল বিছিয়েই, অনাহার ও অনিদ্রার অবসাদে নেতিয়ে পড়েছিলেন প্রাণদা। হঠাৎ কার হাত যেন স্পর্শ করলো তাঁর কপাল অতি নিম্নস্বরে ডাক শোনা গেল—'মা, মা গো!'

কে? কে ডাকে মাতুর মত গলা করে তাঁকে? এ কি স্বপ্ন? ধড়মড়িয়ে অনশন দুর্বল শরীরটাকে তুলে উঠে বসলেন প্রাণদা! মাতঙ্গকে চোখের সামনে দেখে, চিৎকার করে উঠতে যেতেই, ছোট হাতের চেটোয় চেপে ধরলো মায়ের মুখ মাতঙ্গ। বলল—'চুপ করো,

মা। আমি এখানে এসেছি এ-খবর ওরা জানতে পারলে তোমার, বাবার, আমার—কারুর রক্ষা থাকবে না।' এই বলে, মায়ের বুকের মধ্যে মুখ-খানা গুঁজে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল—'তুমি কথা দাও, এখন থেকে তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে আগের মতন ?'

দুই বাহুতে বুকের ধনকে বুকে চেপে ধরে মা বললেন—'তুই ঘরে থাকবি তো ?'

'না, মা। আমি ঘরে থাকতে চাইলেও, ওরা আমাকে থাকতে দেবে না। টেনে নিয়ে যাবে জেলখানায় ?'

ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রাণদা শুধালেন—'কেন ? তুই কি করেছিস ?

এমন কিছুই করিনি মা। মাষ্টার মশাই মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়েছিলেন বলে পুলিশ লাঠি মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। মাষ্টার মশাই-এর সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেখে, আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি নি। দারোগার বন্দুক দিয়েই গুলি ছুঁড়ে দারোগাদের ভয় দেখিয়ে, মাষ্টার মশাইকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

আঁৎকে উঠলেন হালদার গৃহিণী—'খুন করেছিস নাকি দারোগাকে ?'

'না, মা।' সান্ত্বনার সুরে বালক বলল, 'বন্দুকের নলটা ওপর দিকে করে গুলিটা ছুঁড়েছিলাম। কেবল বড় কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে একটা।'

'মাষ্টার কোথায় ?'

'কাকদ্বীপে। ওঁর এক বন্ধুর কাছে আছেন।'

'আর, তুই ?'

'সাধুবাবার ঘরে। ঐ তুমি যাকে বৈরাগীদাদা বলো।'

'অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হল এবার মাতৃহৃদয়। তবু শুধালেন—'খাওয়া-দাওয়া করছিস কোথায় ? কি খাচ্ছিস ?'

'সাধুবাবাই খাওয়াচ্ছেন চার বেলা। তুমি কোন চিন্তা কোরো না, মা। এবার বলো, এখন থেকে তুমি নাওয়া-খাওয়া করবে তো ?'

আজ তিন দিন পরে, জননীর ওষ্ঠরেখায় হাসি দেখা দিল এই প্রথম। বৈরাগীদাদার কাছে যখন আছে, তখন তাঁর আর চিন্তা নেই। বললেন—আচ্ছা রে আচ্ছা, ঠিক নাওয়া-খাওয়া করবো।' বলে একটু থেমে, পুনশ্চ জানতে চাইলেন—ঘরে ফিরবি কবে?

'খুব শিগগির। যত তাড়াতাড়ি ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে পারবো তত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে পারবো।'

'ইংরেজদের তাড়াবি?'

'হ্যাঁ মা। ওরাই তো বাবাকে, তোমাকে গরীব করে রেখে এত কষ্ট দিচ্ছে। ওরাই তো সেদিন মাষ্টার মশাইএর মাথাটা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিয়েছিল—মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্যে। ওরাই সুভাষ বোসকে কথায় কথায় জেলে পুরে দেয়, সাধুবাবাকে ছয় বার জেল খাটিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, চিত্তরঞ্জন এমন কি মেয়েমানুষ সরোজিনীকেও ছাড়ে নি ওরা। ওদের আমরা তাড়াবোই।'

এই পর্যন্ত বলে, মুহূর্ত্তের নীরবতার মধ্যে কি যেন একটু ভেবে নিল ছেলেটা। তারপর আবার বলল—'সুভাষ, গান্ধী, জহর—ওদের দলেই তো আমি নাম লিখিয়েছি মা। সাধুবাবা আমাকে এবার নিয়ে যাবেন—তিনকড়িদার কাছে। তারপরেই নেমে পড়বো কাজে।'

'কতদিন লাগবে কাজ শেষ হতে—বৈরাগী দাদা কিছু বলে?'

'তা বলেন না। তবে এত নামজাদা মানুষেরা যখন কাজে নেমেছেন, আমার মত হাজার হাজার ছেলে যখন বাবা-মা-ভাই-বোন সব ছেড়ে এসে ক্যাম্প-এ নাম লিখিয়েছে, তখন ইংরেজদের এদেশ থেকে পালিয়ে না গিয়ে আর উপায় নেই। আর, তা ছাড়া……' বালক থামল একবার জননীর মুখের পানে তাকিয়ে।

'তা ছাড়া……কি?'

'তা ছাড়া ঐ শয়তানদের তাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আমায় যে ঘরে ফিরে আসতেই হবে মা। বাণিজ্যে যেতে হবে না!'

'তা, আগেই বাণিজ্যে যা না, বাবা! ফিরে এসে না হয় ইংরেজদের তাড়াস!'

'না মা। বাবা বলেছে সপ্তডিঙ্গা কিনতে অনেক টাকা লাগবে। তা, টাকা জমাতে সময় লাগবে তো! আমি তো লক্ষ্মীর কৌটোতে পয়সা জমাচ্ছিই মা।'

এই সময়ে, দূরের পিপুল গাছের পাশ থেকে কে যেন টর্চের আলো ফেলল এ দিকে। মা চম্‌কে উঠলেন। টর্চ জ্বলছে আর নিভছে। একবার, তুইবার, তিনবার।

সেদিকে লক্ষ্য করে চঞ্চল হয়ে উঠল ছেলেটা। বলল—মা সাধুবাবা এসে গেছেন, মা, ঐ যে টর্চ দেখাচ্ছেন। এবার আমায় যেতে হবে।'

'সাধুবাবা, সাধুবাবা বলিস কেন? ডাকবি—সাধুমামা বলে, বুঝলি? আমি যে ওঁকে দাদা বলি।'

'আচ্ছা, মা।'

'আর, বৈরাগী দাদাকে বলে দিবি—তাঁরই হাতে গচ্ছিত রাখলাম আমার বুকের ধনকে। তোর সব দায়িত্ব তাঁর।'

'আচ্ছা, তুমি একেবারে চিন্তা-ভাবনা করবে না আমার জন্যে। বাড়ীতে থাকলে ঐ পুলিশের দল আমায় ঠিক ধরে নিয়ে যাবে জেল-এ।'

'সে কথা ভেবেই তো তোকে তুলে দিলাম আজ ওই বৈরাগী দাদার হাতে। কখনো ওঁর কথার অবাধ্য হয়ো না যেন।

'আচ্ছা।'

বিদায় মুহূর্ত্ত সমাসন্ন। মার চোখে জল টল টল করে উঠছে আবার। সেই জল আঙ্গুল দিয়ে মুছে দিয়ে, বাক্যরুদ্ধস্বরে বলল প্রাণদার কোলের সন্তান—'কেঁদো না, মা। আমি তো মাঝে মাঝে

এদিকে আসবোই, তখন দেখা করে যাবো টুক করে।' চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলো মাকে। মা ওর মাথায় তুইবার থু থু করলেন, ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দংশন করলেন দাঁত দিয়ে, নিজের বাঁ পায়ের ধূলো ডান হাতে তুলে নিয়ে পুত্রের শিরে রাখলেন সেই হাত। সন্তানের অনাগত আপদ-বালাই-এর বিরুদ্ধে অসহায়া জননীর হৃদয়-রাজ্যের নিঃশব্দ যুদ্ধ ঘোষণা।

মাতঙ্গ চলে গিয়েছিল কিছুটা পথ, আবার ফিরে এলো। মার কোমরটা তুই হাতে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'মাগো, আমি এখানে থাকলে বাবা তো আমাকে টিফিনের পয়সা দিতই! তুমি বাবাকে বলে দিও, সেই তুটি করে পয়সা বাবা যেন রোজ লক্ষ্মী-ভাণ্ডারে ফেলে দেয়। বলো মা, বলবে তো ?'

ধরা গলায় জননী জানালেন—বলবেন তিনি।

একটু হাসবার চেষ্টা করে মাতঙ্গ বলল—'পয়সা না জমালে, বাণিজ্যে যাবো কেমন করে।'

বলেই, এক মুহূর্তে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে অন্ধকারে।

॥ ছয় ॥

তেত্রিশ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রীটে কর্পোরেশনের মডেল স্কুলের কাজ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই বাড়ীর সঙ্গে খানিকটা রেলিং-ঘেরা জমি ছিল। সেই জমিটাতে, আদর্শ-নিষ্ঠ বিপ্লবীমনা তিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর গৃহের ছাদের 'তরুণ সঙ্ঘ'কে স্থানান্তরিত করলেন। তখন বৃটিশের চোখে ধূলো দিয়ে বিপ্লবের কাজ চালাবার মৎলব নিয়ে, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশে কলকাতায় এবং শহরতলীতে অনেকগুলো ছোট কিন্তু মজবুত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো, ঐগুলি বুঝি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। একটু খেলাধূলো করে, গান-নাটকে মাতে, কালী পূজো, সরস্বতী পূজো করে। ব্যস্। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু আসলে ঐ জোয়ান ছোঁড়াগুলো যে কোন্ কাজের জন্যে দিনের পর দিন গান দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করছিল, তার খবর রাখতো কেবল হাতে-গোণা কয়েকজন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিজয় সিং নাহারের 'ব্রতীবালক সংঘ', ইণ্টালিতে 'মুকুল সংঘ', সত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর 'বয়েজ ক্যাম্প,' চাঁপাতলা অঞ্চলের হরিশ্চন্দ্র শিকদারের 'শক্তি সেবক সঙ্ঘ', তিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের হাতে-গড়া 'তরুণ সঙ্ঘ', শিবরামপুরের কাছাকাছি সরসুনা গ্রামের ডাঃ শচীমোহন মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত তরুণ সংঘের আর এক শাখা। বরিশা সাবর্ণ পাড়ায় অধ্যাপক অমিয় মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট সংগঠন—এইরকম আরও

অনেক সংঘ, সমিতি, সংগঠন, ক্লাব—তখন লড়িয়ে ছেলে গড়ার কাজে ব্যস্ত।

এই সময়ে, একদিন বিপ্লবী কালী মুখার্জির বাড়ীর একতলায় (ওয়েলিংটনস্থ) যে ঘরে তরুণ সংঘের কেন্দ্রীয় অফিসটি ছিল, সেই ঘরে কালী মুখার্জি (পরে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী হয়েছিলেন), ডাঃ বিধান রায় এবং তিনকড়ি গাঙ্গুলী মশাই বসে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। লাহোরের বোর্স্টাল জেলে ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হয়ে আসছে মহাবিপ্লবী বীর যতীন দাসের জীবন প্রদীপ। মতিলাল নেহেরুর উত্তেজনা তখন চরমে। ঘন ঘন তিনি খোঁজ নিচ্ছেন দীর্ঘ দিন অনশনে থাকা বাঙ্গালী যুবকটির। জেলে যাঁরা অনশন করেছিলেন একই সঙ্গে, তাঁদের একে একে অনশন ভঙ্গ করেছে সবাই, এমন কি ভগৎ সিং-ও, কিন্তু আশ্চর্য্য মনের শক্তি এই যুবক যতীনের, তাঁর শপথ থেকে টলাতে পারলো না তাঁকে কেউ। ১৯২৯শের ৩১শে জুলাই খবর বেরুলো ফ্রী প্রেস-এ—'যতীন দাসের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি আঠারো দিন ধরে অনশনে আছেন। গত রাত্রে (মঙ্গলবার, ৩০শে জুলাই) তিনি বারবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। দাসের ছোট ভাই কিরণচন্দ্রকে হাসপাতালে রাত্রে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।' ১লা অগাষ্টের খবর—'যতীন্দ্রনাথ দাসের অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় ডাক্তার তাঁর জন্য নার্সের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। কিন্তু দাস নার্স রাখতে রাজী না হওয়ায় তাঁর ভাই কিরণচন্দ্র সারা রাত্রি তাঁর কাছে থাকেন। কিরণবাবু বারবার তাঁর দাদাকে একটু জল খেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দাস রাজী হন নি।

এইসব কথা যখন আলোচিত হচ্ছে, বিধানবাবু বললেন, 'কত বড় বড় নেতা যতীনকে অনশন ছাড়তে অনুরোধ করলেন, কিন্তু উনি অনড়। এই রকম তেজস্বী পুরুষ যে এই বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছেন, এর জন্যে বাঙালী মাত্রই গর্ব্ব অনুভব করবে। বিপ্লবী

বিজয়কুমার সিংহ হচ্ছেন লাহোর জেলের অনশনব্রতীদের অন্যতম। তাঁর কাছ থেকে খবর এসেছে গোপন সূত্রে যে—তাঁদের মধ্যে যতীন দাসই প্রথম—জোর করে খাওয়ানোর পদ্ধতি ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। যে ডাক্তার, অনশনের তুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই, জোর করে নাকে-মুখে নল ঢুকিয়ে অনশনীদের তরল খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করছিলেন, তিনি যতীন দাসের কাছে এলেন সঙ্গে দশজন পাঠান পুলিশ নিয়ে। যতীনও দৈহিক শক্তিতে কম ছিলেন না। কলেজে শরীর চর্চ্চার জন্য তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি দশজন পাঠানের সম্মিলিত প্রয়াসকেও বেশ কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করে-ছিলেন তেরো দিন অনশনে থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু একা ঐ তুর্বল দেহে যুঝবেন কতক্ষণ। শেষ পর্য্যন্ত ঐ পাঠানের দল জোর জবরদস্তি নল ঢুকিয়েছিল যতীনের নাকে গলায়—যার ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল তাঁর গলা দিয়ে। কাবু হয়েও কিন্তু হার স্বীকার করেন নি শেষ পর্য্যন্ত যতীন। হঠাৎ তিনি ভীষণ জোরে কেশে উঠলেন। ফলে, রবারের নলটা খাদ্যনলী থেকে শ্বাসের নলীতে ঢুকে গেল। তুধের অর্ধেকটাই চলে গেল ফুসফুসে। যতীন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

দারুণ উত্তেজিত কণ্ঠে তিনকড়ি বলে উঠলেন—দক্ষিণ কলকাতার যতীন আজ যে দৃষ্টান্ত রাখলেন—তাতে সারা ভারতের তরুণের দল একটা নতুন উদ্দীপনা অনুভব করবেই। কিন্তু, আজ তো ১১ই সেপ্টেম্বর। কে জানে আজ যতীনের অবস্থা কিরকম ?'

বিধানবাবু মলিন হাসি হাসলেন, আমরা ডাক্তাররা জানি—যে লোক কুঁজোর জলে জেল কর্তৃপক্ষ গোপনে গ্লুকোজ মিশিয়ে দিচ্ছে জানতে পেরেই জল খাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে, ষাট দিন অনশনের পরে, তার অবস্থার কতখানি অবনতি ঘটতে পারে। যতীনকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তাঁর ওজন ছিল ১৪৯ পাউণ্ড। অনশন-ব্রত শুরু করার সময়েও ওজন ছিল ১৩৭ পাউণ্ড। আর, আজ ? আজ

সেই ওজন কমে হয়েছে ১১০ পাউণ্ড। আর কি ওকে বাঁচানো যাবে?'

কালীপদ এতাবধি নীরবেই সব শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন—'শোন নি তিনকড়িদা, গত ২রা অগাষ্ট যতীন দাসের ভাই কিরণ দাস সুভাষ বোসকে টেলিগ্রামে জানিয়েছে—Dada's condition hopeless. Pulse 45. Doctors silent. Wire instructions. বিধান জানালেন জহরলালের কাছে এলাহাবাদেরও খবর এসেছে—Lahore hunger striker's condition critical. Death inevitable. Presence necessary. Wire. তারবার্তাটি পাঠিয়েছেন রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী শ্রীধন্বন্তরী।

তিনকড়ি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—গত ১১ই অগাষ্ট লিবার্টি পত্রিকার সম্পাদকীয়টা পড়েছেন? অনশনরত ঐ জেল-বন্দীদের সম্পর্কে লিবার্টি লিখেছে—

The fate of these high spirited youngmen is trembling in the balance, any morning we may wake up to learn that they have passed beyond the reach of Jail-Codes. ......The spirit of freedom must be kept alive at any cost if the nation is to live again and these youngmen offer their own bodies as fuels that the sacred fire may be kept burning from generation to generation.

'অপূর্ব্ব! মনে হয় সম্পাদক নিজে লিখেছেন এই হৃদয়স্পর্শী প্রবন্ধ।' বিধানবাবু উচ্ছ্বসিত। কালীপদ বললেন—'লাহোর থেকে আমার এক বন্ধুর পত্রে জানলাম—গত ৩০শে অগাষ্ট জেলখানায় যতীন দাসকে দেখতে যান ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব, পণ্ডিত শান্তনম্,

সর্দ্দার সাদূ‌র্ল সিং কবিশের এবং ভগত সিং-এর বাবা সর্দ্দার কিষণ সিং।'

বিধানচন্দ্র এবং তিনকড়ি দুইজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন—ঐ প্রসিদ্ধ চার ব্যক্তিত্বর সঙ্গে যতীন দাসের কি কথা হল, তাই জানতে।

আমার সেই লাহোরের বন্ধুটি ঐ সেণ্ট্রাল জেলেরই কর্মচারী। সে ডেপুটিসুপারিণ্টেণ্ডের ডায়রী থেকে তুলে নিয়ে আমাকে যা লিখেছে, তা এই পকেটেই আছে, পড়ে দেখতে পারো।

কালীবাবুর হাত থেকে কাগজটা এক রকম যেন কেড়েই নিলেন তিনকড়িবাবু ঔৎসুক্যের আধিক্যে। তারপর জোরে পড়তে শুরু করলেন জেল দর্শনে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে যতীনের কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ—

(Ref : Confidential letter No. 12 (0) 18 C dt. 31. 8. 29 from Supdt. Borstal Jail, Lahore, to the Home Secy, of the Punjab Govt., Simla)

ডাঃ গোপীচাঁদ—মিঃ দাস, কেমন আছেন ?

(উত্তর নেই, যতীন দাস নীরব)

ডাঃ গোপীচাঁদ—আপনি কথা রাখলেন না। আপনি বলেছিলেন যে, এই ক'টা দিন বেঁচে থাকবেন কিন্তু, এভাবে কি সম্ভব তা ? (তবুও কোন উত্তর এলো না।)

ডাঃ গোপীচাঁদ—কেন ওষুধ খাচ্ছেন না, বলুন তো ?

(কোন উত্তর এলো না এবারও।)

ডাঃ গোপীচাঁদ—আপনার মৃত্যু হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র একজন ছাড়া, কমিটির আর সকলেই সবগুলি দাবী আপনাদের মেনে নিয়েছেন। আপনি যদি চান, আমি তাঁদের সকলকে এখানে আনতে পারি।

আপনি বলেছিলেন—ওরা আপনার দাবী মেনে নিলে, আপনি অনশন ভঙ্গ করবেন। এইবার আপনি আপনার কথা রাখুন।

(যতীনের কাছ থেকে তবুও কোন উত্তর এলো না।)

এই সময় পণ্ডিত শান্তনম্ বললেন—

'মিঃ দাস, আমরা জানি মৃত্যু আপনার কাছে কিছুই নয়। আপনাকে আদর্শচ্যুত করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমরা বলছি না যে, আপনি অনশন ভঙ্গ করুন। ওযুধ খেয়ে ক'দিন বেশি বাঁচার মানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। কিন্তু তবু আমাদের জন্যে, জেল কমিটির অনুমোদনের ফল কি হয়, শুধু সেইটুকু দেখবার জন্যে আপনাকে আরও ক'দিন বাঁচতে বলছি।

(যতীন জিতেন সান্যালের মুখের দিকে তাকালেন। সান্যাল নীচু হয়ে দাসের মুখের কাছে কান রাখলেন। একটু ঠোঁট নড়লো যতীনের। সান্যাল জানালেন— যতীন বলছেন, উনি বাঁচতে চান না।)

ডাঃ গোপীচাঁদ—কিন্তু আপনি কথা রাখছেন না। বলেছিলেন, দুই সপ্তাহ বেঁচে থাকবেন। এখনও তো চোদ্দ দিন হয় নি!

(সান্যালের কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন যতীন—)

যতীন— ৪ঠা সেপ্টেম্বর চৌদ্দ দিন পূর্ণ হবে। ঐ দিন পর্যন্ত আমি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবো।

টেবিলের উপর করাঘাত করে বিধান বলে উঠলেন—দাস তো রক্ষা করেছেন তাঁর কথা। আজ এগারোই সেপ্টেম্বর। এখনোও তো উনি বেঁচেই আছেন।

তিনকড়ি বললেন—'আচ্ছা, ষাট ষাটটা দিন যে ছেলেটা একটা দানা পর্য্যন্ত দাঁতে কটেলো না, যে ইঞ্চি ইঞ্চি করে হাসি মুখে মৃত্যুর দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার, শুনতে পাচ্ছি, দীর্ঘ অনশনে দুই হাতই অকর্মণ্য হয়ে গেছে, দুটি পা-ই অবশ, চোখের দৃষ্টিশক্তি বলতে আজ আর কিছুই নেই, তাকেও ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মুক্তি দিতে ভয় পায় ?

এই সময় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এসে প্রবেশ করলেন ঘরে। থম্ থম্ করছে মুখটা। তিনকড়ির প্রশ্নের জবাব তিনিই দিলেন—কাওয়ার্ডস্। কাপুরুষের জাত যে ইংরেজ, রয়ালবেঙ্গল টাইগারকে ওরা ভয় পাবে না তো কাকে পাবে ? জানতে পেরেছি গত ৩রা সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী C. M. G. O'gilvie স্বরাষ্ট্র সচিব ইমার্সনের কাছে একটা চিঠিতে (No. 5/c dt. 3. 9, 1929) লিখেছেন—যদি ক্রিমিন্যাল কোডের ৪৯৭ (১) ধারা অনুযায়ী গুরুতর অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে, যতীনদাসের জামিনের আবেদন করা হয়, তাহলে, আমাদের তা গ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু জামিনের মূল্য সেক্ষেত্রে, অন্ততঃ দশহাজার টাকা হওয়া চাই, আর এটাও পরিষ্কার থাকা চাই যে, দাস যে কদিন অসুস্থ থাকবে, কেবল-মাত্র সেই কদিনের জন্যেই তাকে জামিন দেওয়া হবে।'

'এই রকম যার দেহের অবস্থা, তার জামিনেও শর্ত আরোপ ?' বিধান বিস্ময় জ্ঞাপন করলেন। বিপিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—ওরা যে যতীনকে 'বাংলার বাঘ' ছাড়া আর কিছুই ভাবে না, এবং যতীনকে যে কী ভীষণ ভয় করে ঐ কাপুরুষের দল সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি O'gilvie'র ঐ নোটের বাকী অংশটুকু শোনো।' 'কি লিখেছে

আরও ঐ পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ?' কালিপদ জানতে চাইলেন। 'লিখেছে, এই ষড়যন্ত্র মামলায় দাসের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ রয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, বোমা তৈরি করা, সেগুলোকে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো, এবং বোমা তৈরি করার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে দাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সে আগ্রা এবং শাজাহানপুরে বোমার কারখানায় কাজ করেছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে যতীন দাসই হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক। লাহোর ষড়যন্ত্রের আগেও সে এধরনের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। কলকাতায় প্রকাশ্য রাজপথে একটি ডাকাতিতেও সে ছিল। বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে সে যুক্ত এবং বিপ্লবীদের মধ্যে যাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হয়, দাস তাদেরই একজন। স্যার ডি. পেট্রির (D. Petrie) অভিমত যে, দাসকে যদি বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়, এবং সে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আমাদের কাছে সে ভয়ঙ্কর একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবেই বেঁচে থাকবে।'

তাই নাকি ? একটা মরন্ত মানুষকে এখনও এত ভয় ? কালীপদও কম বিস্মিত নন। চিন্তাগভীর স্বরে বিধান বললেন, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে—Das has fever. Evening temperature—99·2 degrees, pulse—100 p. m. Vomitting and retching persist. No urine today. Severe headache and cramps in muscles of legs and arms…very grave condition. আশ্চর্য্য এই মৃতুবরণ ব্রত ! যতীন আমাদের মত পরাধীন দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মর্য্যদার দাবীতে অনশন করছেন। জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি যেন মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়, বন্দীদের প্রাপ্য সুখস্বুবিধা যেন তাঁরা পান। এই অনশন চলার মধ্যে যতীন বারবার একই কথা উচ্চারণ করেছেন—'আমি অনশন শুরু করার আগে শপথ

নিয়েছিলাম—যদি দাবী পূরণ না করেন জেলকর্তৃপক্ষ, আমি না খেয়ে থাকবো, আমরণ বিপ্লবীর কাছে দেশই একমাত্র সত্য। দেশের মর্য্যাদার জন্য মৃত্যুকে বরণ করা সে তো পরম গৌরবের! আমি, তাই মরতেই চাই।' বিপিনবাবু বললেন—'হাড়ে মজ্জায় ঢুকে গেছে বিশ্বাসঘাতকতা এই ইংরেজ জাতটার। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট বলেছিল, তাদের নিযুক্ত জেল এনকোয়ারী কমিটির পাঁচজন সভ্যই যদি একযোগে বলেন যে, যতীন দাসকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া উচিত তাঁর দৈহিক অবস্থার ক্রমাবনতির জন্যে, তাহলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে অবশ্যই মুক্তি দেবেন। কিন্তু কই, বিশ্বাসঘাতকরা তা করলো কোথায়?' 'জেল এনকোয়ারি ওঁর রিলিজের জন্যে রেকমেণ্ড করেছিলেন?' তিনকড়ির প্রশ্ন। 'নিশ্চয়!' বিপিন বলে চল্লেন, '২রা সেপ্টেম্বর জেল এন-কোয়ারি কমিটির পাঁচজন সদস্যই, লাল ছুনিচাঁদ, মহাতাব সিং, আব্দুল হক এবং মোহনলাল জেলে গিয়ে চাক্ষুষ যতীনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে লিখেছিলেন—We the undersigned members of the Punjab Jails Enquiry Committee desire to make the following statement as to the circumstances which led to the discontinuance of the hungerstrikes of the Lahore conspiracy case······ at our earnest request, and further in view of the condition of Sj. Jatindra Nath Das, one of the hungerstrikers. Bhagat Singh and all others have discontinued from 5-00 pm today the long drawn hungerstrike······' জেল এনকোয়ারি কমিটির বাকী অংশটুকু বলার আগেই কালীপদ প্রশ্ন করে বসলেন—'তাহলে, ২রা সেপ্টেম্বরেই অনশন ত্যাগ করেছেন ভগত সিং-এর সঙ্গে অন্যসব অনশনব্রতীরাও?' বিপিন থামলেন না। বলেই চল্লেন, 'হ্যাঁ। এই এনকোয়ারি কমিটি তাঁদের বিবৃতির শেষে লিখলেন—We earnestly request that

in view of the critical condition in which Sj. Jatindra Nath Das is lying in jail, the Government will be pleased to order his release immediately. এই তো ওঁরা রিলিজের জন্যে রেকমেণ্ড করেছেন, তবে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট যতীনকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন? গভর্ণমেন্ট তো বলেই-ছিল—যদি কমিটি মেম্বাররা সকলে একযোগে বলেন, তাহলে নিশ্চই ছেড়ে দেওয়া হবে মুমূর্ষু বিপ্লবী ঐ যতীনবাবুকে।' তিনকড়ি বললেন।

তেমন নিশ্চয়তাই তো পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট দিয়েছিল, বিপিনের কণ্ঠে ক্ষুব্ধতা সুপষ্ট, কিন্তু সে-নিশ্চয়তা গেল কোথায়? এমন D. Petrie অভিমত প্রচার করেছে বিশ্বাসঘাতকের দল। পেট্রি নাকি বলেছে, দাসকে যদি বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তাদের কাছে দাস ভয়ঙ্কর একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবেই বেঁচে থাকবে।' একটুক্ষণের জন্য নীরব হলেন বিপিন। তারপর ক্রোধবিকৃত স্বরে পুনশ্চ বললেন—'সেণ্ট হেলেনায় বন্দীদশায় নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একদিন উন্মাদের মত চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন—Perfidy, thy name is England। ফরাসী নেপোলিয়ন ঠিক চিনতে পেরেছিলেন ইংরেজদের।

এরপর ঘরের সকলেই বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন প্রস্তর-মূর্তির মত। কারুর আর কিছু বলার বা শোনার প্রবৃত্তি যেন, উধাও হয়েছে হঠাৎ। সুদূর পাঞ্জাবের কারাগারে মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক বিপ্লবী বাঙ্গালী যুবক—তিল তিল করে নিজেকে সমর্পণ করেছে মৃত্যুর প্রসারিত বাহুতে, তারই সংবাদ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় কোটী কোটী তরুণের রক্তের দুরন্ত প্রবাহে। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নতুন শপথ-বেদী—মৃত্যুভয়কে জয় করে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার সাধনার শপথ।

ঠিক এই মুহূর্তে, তিনকড়ি গাঙ্গুলীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটি কিশোরের মুখ। নরেন বৈরাগী নিয়ে এসেছেন তাঁর কাছে মহেশ-তলার খনি থেকে অনেক খুঁজে পেতে। ছেলেটার প্রতি কথাতেও যেন ঐরকম কঠিন শপথেরই ঝঙ্কার। দারুণ একগুঁয়ে বিপদের মধ্যেও আশ্চর্য্য রকমের শান্ত।

আজ, আসলে, তিনকড়ি এসেছিলেন কালীপদ বাবুকে ঐ নবাগত কিশোরটির কথা বলতে।

মেঘটা ছোট সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা যে বজ্রগর্ভ—তাতেই বা সন্দেহ কোথায়?

কিন্তু, বলা আর হল না। যতীন্দ্রনাথের অন্তরের আগুন এখন সারা দেশকে পরিণত করেছে এক গুরুগুরু গর্জনরত আগ্নেয়গিরিতে। যে কোন মূহূর্তে তাতে শুরু হতে পারে অগ্ন্যুৎপাৎ, যে কোন মুহূর্তে নিঃসৃত হতে পারে ঐ আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর থেকে ফুটন্ত লাভার স্রোত।

এখন অন্য কোন কথা শুনবে কে?

॥ সাত ॥

এদিকে দুই পক্ষই প্রস্তুত হতে লাগলো পুরো দমে। যতীন্দ্র-অনুসারীরা যখন বুঝলেন মৃত্যুর আর দেরি নেই, তখন তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন—যতীন দাসের মরদেহ যাতে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায়। আর অন্যদিকে তার ঘোরতর বিরোধিতা করতে লাগল ইংরেজ গভর্ণমেন্ট—গোপনে গোপনে।

অবশ্য, যতীন্দ্র-অনুসারীদের প্রস্তুতিপর্ব্ব শুরু করলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ নিজেই। অগাষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্রিগস্‌কে ডেকে পাঠালেন। ব্রিগস্ এলে তিনিই প্রথম তাঁকে নিজের শেষ ইচ্ছাটি জ্ঞাপন করলেন। সে ইচ্ছাটি হল—মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন কলকাতায় যেখানে তাঁর মা ও বোনকে দাহ করা হয়েছে, সেখানেই দাহ করা হয়। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কথা দিলেন—গভর্ণমেণ্টকে যতীনের শেষ ইচ্ছা তিনি নিশ্চয় জানিয়ে দেবেন। জানিয়ে দিয়েছিলেনও। কিন্তু জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজপুরুষদের অবস্থা হল শোচনীয়। ভাবনায় আর ভয়ে একেবারে অস্থির। প্রথমেই ভারত সরকারের তরফ থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারী এমারসন উঠে পড়ে লাগলেন যাতে রেল কর্তৃপক্ষ শব-বহন করার জন্যে বগী দিতে রাজী না হন। সে চেষ্টা নিষ্ফল হল। রেল বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হ'ল—My dear Emerson········After looking up the Railway act we came to the con-

clusion that it would be impossible for the Railways as Public carriers to refuse a specific consignment provided the rules of the tariff regulations were complied with and there is not much chance of any of the ordinary regulations being over looked in the possible case you referred to.........In the circumstances I am afraid Railway could not assist. (Home Pol. Fle No 21/63 of 1929). তখন বাঙলা সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে লিখলেন ভারত সরকারকে ১।৯।২৯শের এক তারবার্ত্তায়—'আমাদের সংবাদ যে, মৃতদেহ কলকাতায় এনে শোভাযাত্রা ইত্যাদির দ্বারা প্রবল গোলমালের সৃষ্টি করা হবে। মৃতদেহ প্রদর্শিত হলে উত্তেজনা চরমে উঠবে।.........সম্ভব হলে মৃতদেহ বাঙলার বাইরে কোথাও দাহ করার ব্যবস্থাই বাঙলা সরকারের মতে যুক্তিযুক্ত। তবে, চিতাভস্ম বহন করে আনা নিবারণ করার কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না।

এদিকে, জেলের মধ্যে বসেই যতীন্দ্র-অনুজ কিরণচন্দ্র দাস অনুরোধ জানালেন 'দৈনিক প্রতাপ'-এর সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রকে—সিমলায় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের চীপহুইপ সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রকে এই সমস্ত ব্যাপারটা জানাবার জন্যে। সত্যেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য কৌশলে উর্দ্ধতন সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি আদায় করে ফেললেন মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই। আদেশ এলো, মৃত্যুর পর, যতীন্দ্রনাথের দেহ যেন তাঁর ভাই কিরণচন্দ্রের হাতে অর্পণ করা হয়। শ্রীবীরেন্দ্রের কাছ থেকে এই খবর পেয়েই, কিরণ ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গবের মাধ্যমে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেন—যাতে মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় ট্রেনে। অচিরেই রেলওয়ে জানালো—শব বহনের জন্য অগ্রিম ছয়শো টাকা জমা দিতে হবে। চোখে অন্ধকার দেখার ছেলে কিরণ নন। তিনি অনেক চিন্তা করে সুভাষ বোসকে অনুরোধ

করলেন এই টাকাটি দিয়ে দেবার জন্যে! এবং, বলাই বাহুল্য, সুভাষ সঙ্গে সঙ্গে মানিঅর্ডার যোগে ঐ ছয়শো টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

বৃটিশ রাজত্বে বৃটিশের জেল-এ বসে বৃটিশ প্রশাসনের সমস্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন কিরণচন্দ্র এমনিভাবে—সুপটু ক্ষিপ্রতায়।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, বেলা ঠিক একটা বেজে পাঁচ মিনিটে ভারতের দ্বিতীয় দধীচীর দেহাবসান ঘটল, কিন্তু প্রাণশিখা তাঁর অম্লান দীপ্তিতে অনির্বাণ তেজে ব্যাপ্ত হল মুহূর্তে আসমুদ্রহিমাচলের কোটী কোটী মানুষের মর্মবেদীতে। প্রাণে প্রাণে জ্বলে উঠল দাবানল। বিজয়কুমার সিংহ, জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল, অজয় ঘোষ সাশ্রু নেত্রে বিদায় জানালেন তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুকে—বোর্স্টাল জেলে সেদিন শারদ-মধ্যাহ্নে।

একে একে সদ্যপ্রয়াতের পাশে এসে দাঁড়ালেন সমস্ত জেল-বন্দীরা। তাঁদের কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সেদিন বেদ মন্ত্রের মত সাড়া জাগাচ্ছিল যেন সকলের হৃদয়ে। গান শেষ হলে—বৃটিশ জেলের আকাশ-বাতাস তোলপাড় করে কয়েক শো বন্দীর কণ্ঠ একই সঙ্গে গর্জে উঠল—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলে। কেঁপে উঠল জেল কর্তৃপক্ষ, কেঁপে উঠল ইংরেজ শাসকবর্গ সে হুঙ্কারে।

এ-সংবাদ কলকাতায় পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো সারা নগরী। দক্ষিণ কলকাতায় বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত দোকান-পাট। ছাত্রেরা দলে দলে মিছিলে বেরিয়ে এলো। তাদের হাতে কৃষ্ণ পতাকা। সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে শোকবিহ্বল মানুষের আর্ত হাহাকার।

সুভাষচন্দ্র জামশেদপুর পরিভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন তখন। খবর তাঁর কানে পৌঁছনোর পরেই তিনি তাঁর সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। ১৪ই কলকাতায় পৌঁছেই তিনি বি. পি. সি. সি.-র সভাপতি হিসেবে আবেদন জানালেন—রবিবার, ১৫ই সেপ্টেম্বরকে 'শোক দিবস' রূপে পালন করার জন্যে।

১৪ তারিখের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা (লাহোর থেকে প্রকাশিত) সম্পাদকীয়তে লিখল—'যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোন মানুষ বীরের মত মৃত্যু বরণ করে থাকে, তবে সে মানুষের নাম যতীন্দ্রনাথ দাস।·········ম্যাকসুইনির মৃত্যুতে আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

'কে বলতে পারে—দাসের এই আত্মদানে ভারতের স্বাধীনতাও ত্বরান্বিত হবে না?'

দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ প্রথম পৃষ্ঠায় যতীন দাসের মৃত্যু-সংবাদের শিরোনামায় লিখল – Lived a hero, died a martyr.

১৩ই সন্ধ্যাতে, সিমলায় আইনসভা সভ্যদের একটি পার্টির নিমন্ত্রণ করেছিলেন Sir G. Schustre-এর পত্নী; পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তা বর্জন করতে নির্দ্দেশ দিলেন কংগ্রেসী সভ্যদের। শোকার্ত স্বরে তিনি বললেন, Jatin Das bravely laid down his life for what he believed to be the cause of the country. As a mark of respect for the memory of that great soul, I direct that no member of the Congress Party will attend the party.

মরদেহ বহন করে 'লাহোর এক্সপ্রেস' বিকেলের দিকে দিল্লীতে এসে যখন পৌঁছলো, ষ্টেশনে তিল ধারণের স্থান নেই তখন। দিল্লী শহর ভেঙে পড়েছে যেন। সহস্র কণ্ঠের সম্মিলিত শ্লোগান শোনা গেল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, যতীন দাস জিন্দাবাদ। ফুল আর ফুলের মালায় ছেয়ে গেল শবাধার।

কানপুরে অপেক্ষা করছিলেন বিপুল জনতার সামনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। রাত আড়াইটেতে ট্রেন গিয়ে দাঁড়াতেই ছুটে বগীর

ভিতরে প্রবেশ করলেন জহরলাল। অনশন শীর্ণ মৃত্যুদীর্ণ যতীনের মুখের দিকে চেয়ে প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি—How will I remember his gentle face soft as a girl's in that prison hospital in Lahore !

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল মাতঙ্গের।

তার পাশের খাটিয়ায় কে যেন মুখ গুঁজে কাঁদছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে, গুমরে গুমরে কাঁদছে। ওটায় অন্যদিন বৈরাগী শুতেন। কিন্তু কাল সারাদিন বৈরাগীর দেখা পাওয়া যায় নি একবারও। বৈরাগী কিছু পয়সা সব সময়ে দিয়ে রাখতেন মাতঙ্গের কাছে। উঠতি বয়েস, খিদের কি কোন সময় অসময় আছে। বলে রেখেছিলেন, খিদে পেলেই দোকান থেকে কিছু কিনে খেয়ে নিবি। রাত এগারোটাতেও যখন ফিরলেন না বৈরাগী, তখন নিরুপায় হয়ে হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে তেলে ভাজা লুচি খেয়ে শুয়েছিল মাতঙ্গ। ঘরের কোণের লম্ফটার বোধহয় তেল ফুরিয়ে গেছে, সেটি কখন নিভে বসে আছে। ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। তারই মধ্যে দমকে দমকে শোনা যাচ্ছে চাপা কান্নার আওয়াজ ঠিক খাটটার ওপরে!

কে? কে কাঁদছ গো?—গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো মাতঙ্গ। আর, তক্ষুণি থেমে গেল কান্না। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে, পাশের খাটিয়া থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো—আমি দাদা ভাই।'

'বৈরাগী মামা? বিস্মিত মাতঙ্গ তাড়াতাড়ি গিয়ে হাতড়ে দেশলাই বের করলো মামার বালিশের নীচ থেকে, লম্ফে কেরোসিন ভারলো কোণে রাখা শিশিটা থেকে। তারপর খস্ করে জ্বালালো লম্ফটাকে।

একি চেহারা হয়েছে মামার আজ। মা বলে দিয়েছিলেন নরেন বৈরাগীকে মামা বলে ডাকতে, তাই সে আজকাল সাধুবাবা বলে আর

ডাকে না, ডাকে বৈরাগী মামা বলেই, কিন্তু, চব্বিশ ঘণ্টায় একটা মানুষের চেহারার এই হাল হতে পারে? এমনিতে বৈরাগী সত্যিকার সুপুরুষ, রোদে জলে গৌরবর্ণ ম্যাটমেটে হয়ে গেলেও উনি যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংস্কৃতিবান সন্তান, সেটা ওঁর সুন্দর মুখ চোখের গড়ন দেখেই বুঝতে কষ্ট হত না। সেই চোখের তলায় কালি পড়েছে। গাল তুবড়ে গেছে, মাথার জটা, চুল সব আলু থালু। চোখ দুটো তালশাঁসের মত ফুলে উঠেছে। কি হয়েছে মামা? তোমার চোখ মুখের অবস্থা এমন কেন! তুমি কাঁদছিলে?

'না, দাদাভাই। অন্ধকারে বসে আজ আর একবার নতুন করে শপথ নিচ্ছিলাম ঐ অত্যাচারী ইংরেজদের তাড়াবার। ওরা, ওরা রবীনকে বাঁচতে দিল না কিছুতেই (যতীন দাসকেই অনেকে রবীন বলেও ডাকতেন, যেমন বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের স্ত্রী—প্রতিভা সান্যাল।)

'আমার মনে হল, কেউ যেন কাঁদছে।'

'তা তো মনে হবেই। আজ যে শপথ আর কান্না মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ভারত মায়ের বুক চাপড়ানি শুনতে পাচ্ছিস নে? দিল্লী ষ্টেশনে, কানপুর ষ্টেশনে সেই বুক চাপড়ানির প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী। এবার আমাদের পালা। রবীনের দেহ কাল পৌঁছবে হাওড়ায়। তখন তুই আমি সবাই শুনতে পাবো বাংলা মা'র বুকফাটা হাহাকারের শব্দ, দেখতে পাবো তার বুকচাপড়ানি।'

'রবীন কে ছিল, বৈরাগী মামা?' মাতঙ্গ শুধালো।

'এক দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমী, বিবেকানন্দের ভাষায়, এরাই হচ্ছে জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।

বাষট্টি দিন পেটে কোন খাবার না নিয়ে, দেশের কাজে, হাসতে

হাসতে বিদায় নিল এ-দুনিয়া থেকে, ইংরেজের রাজদন্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করে। সারা ইংরেজ সাম্রাজ্য এখন ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে থর থর করে।' উচ্ছ্বাসিত ভাবাবেগকে সংযত করার জন্যেই বোধহয় কিছুক্ষণ বাকহীন হয়ে বসে রইলেন বৈরাগী। তারপর। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে, আস্তে আস্তে আবার বললেন—গোরা অর্থাৎ বিশ্বনাথ মুখার্জি তখন হরিশ মুখার্জি রোডে থাকত, সেই প্রথম নিয়ে আসে রবীন অর্থাৎ ঐ যতীন দাসকে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের কাছে। শচীনদা ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন—এ ছেলের অসাধারণ মনোবল। তিনি তৎক্ষণাৎ যতীনকে নিয়ে নিলেন নিজের দল হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান অ্যাসো-সিয়েশনে। কাশী থেকে কলিকাতায় সস্ত্রীক পালিয়ে এসে শচীনদা দক্ষিণ কলিকাতায় কয়েকটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন—H. R. A. সংগঠনের কাজের জন্যে। সেই সময় যে কয়জন শক্তিমান তরুণকে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, এই যতীনই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য (Jogesh Chatterji in, 'In search of Freedom,' P. 211).'

'সেই যতীন দাস বাষট্টি দিন না খেয়ে মারা গেল, মামাবাবু ? ওর বাবা-মা কত কাঁদছে।'

'মা নেই, বাপ বেঁচে আছে—বঙ্কিম বিহারী দাস। তিনিও কম তেজী পুরুষ নন। কাল দেখতে পাবি হয় তো তাঁকে।'

'আমায় নিয়ে যাবেন তো কাল ?'

'নিশ্চয় নিয়ে যাবো। তোর জীবনে বিপ্লবের বোধন হবে যে কাল। যতীনের আত্মার কাছে শক্তি ভিক্ষা করবি শ্মশানের মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে। কিন্তু, আর নয় দাদাভাই, এবার যা, দুই চোখের পাতা এক করে নে একটুখানি'। মাতঙ্গ নিজের খাটিয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু মনের মধ্যে যাঁর টাইফুনের ঘুর্ণি, ঘুম আসবে তাঁর কোথা

থেকে। পাঁচ মিনিট না যেতেই বৈরাগীর গলা শোনা গেল আবার—'দাদাভাই কি ঘুমোলি?'

'না।'

'চারিদিকের এত বুকচাপড়ানির মধ্যে ঘুম কি আসতে চায়? জানিস দাদা—আজ আমাদের সেন্ট্রাল ক্যাম্পে একটি ছেলে প্রায় এক ঘন্টা ধরে কেঁদে কেঁদে বন্দেমাতরম্ গান করলো। প্রায় তিন শো যুবক তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। তিনকড়িদার সঙ্গে আমিও ছিলাম সেখানে শুধু কান নয়, প্রাণটাও আমার জুড়িয়ে দিয়েছে ঐ গান। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঋষি বঙ্কিমের কলম থেকে বেরুনো 'বন্দেমাতরম্' গানের তাৎপর্য্য আজ যেন আমরা অনুভব করলাম প্রথম নিজেদের রক্তের মধ্যে। যখন ছেলেটার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল—বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তখনই বুঝতে পারলাম যেন—এই মায়ের মূর্ত্তিকে নয়নে রেখেই এতবড় একটা কঠিন তপস্যায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে যতীন। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এ দেশের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দ অশনি নিনাদে দেশের যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন বন্দিনী দেশজননীর শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার সাধনায় আত্মাহুতি দিতে। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল উন্মাদনা সৃষ্টি করলেন যৌবন জল তরঙ্গে—তাঁদের স্বদেশী গান আর বিদ্রোহাত্মক কবিতার মধ্যে দিয়ে। তারপর এলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর আহ্বান আরও স্পষ্ট, আরও উদাত্ত। বল্লেন—দেশমাতৃকা আজ বলি চায়; Suffer so that she may rejoice. সারা ভারতের তরুণের কানে পৌঁছে গেছে এই আগুন-জ্বালা ডাক। তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে প্রাণ দেবার। যতীনের মৃত্যু সেই সত্যটাকেই জানিয়ে দিল আজ। বড় হয়ে জানতে পারবি এইসব যুগান্তকারী ভয়শূন্য দুর্জয় ছেলেগুলোর নাম। রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং, আসফাকউল্লা, শচীন বক্সী, রাজেন লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, ভগবতীচরণ ভোরা—আর কত নাম বলবো? এরা সব রক্তবীজের

দল। এদের এক এক জনের আত্মোৎসর্গ লক্ষ যুবককে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে আত্মদানে। বাংলার অক্ষিতবীর্য্য ছেলে যতীন ঐ রক্তবীজদেরই অনন্য একজন। নাহলে, বুঝতে পারছিস নে, সুভাষের মত মানুষ গর্ব্ব করে সবাইকে বলে বেড়ান—'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোরের আমি যখন জি. ও. সি. যতীন তখন ছিলেন Major-এর মর্য্যাদায়। কোরে যতীনের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (the Indian struggle).'

॥ আট ॥

হাওড়ার ষ্টেশন সেদিন আকূল পাথার।

দুর্বার মানুষের তোড়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো ইয়ার্ডের চারিদিকে। বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজ থেকে ষ্টেশনের অভ্যন্তর পর্যন্ত—যেদিকে তাকাও কেবল মানুষ আর মানুষ।

শুধু প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তের একটি বিশেষ জায়গা ভলান্টিয়াররা পরিবেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিল। যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে ট্রেনের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন—কমলা নেহরু, মৌলভী সামসুদ্দিন আমেদ, বাসন্তী দেবী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, সুভাষচন্দ্র বোস, জে. এস. সেনগুপ্তা, নেলী সেনগুপ্তা, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বরদাপ্রসন্ন পাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সকলেই এসেছেন খালি পায়ে। সকলের চোখমুখেই শোকের ছায়া। যতীনের নশ্বর দেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল হাওড়া টাউন হলে। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বরদাপ্রসন্ন পাইনের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল লাহোর থেকে আসা শহীদের উদ্দেশ্যে।

কিরণচন্দ্র দাসের ক্লান্তি তখন চরমে। তবু ট্রেন থেকে নেমেই—ডিভেন্স কমিটির প্রমীলাদেবী, দুর্গাদেবী, মোহনলাল গৌতম প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দৌড়লেন পুত্র শোকাহত পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে নিজের বাড়ীতে। কিন্তু, সেখানে গিয়ে তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। কোথায় শোক? কোথায় হাহাকার? অত্যন্ত

শান্ত স্বরে বাহান্ন বছরের সদ্য প্রয়াত পুত্রের পিতা বললেন, 'আমার সন্তানের জন্যে আমি গর্বিত আমি আজ সবচেয়ে ভাগ্যবান পিতা।'

হাওড়া থেকে শবদেহ বহনকারীদের সঙ্গে ছিলেম বৈরাগীও। নগ্ন পদ। ঘন ঘন চোখ মুছছিলেন কোঁচার খুঁট দিয়ে। পাশে—কিশোর মাতঙ্গ। উদভ্রান্তের মত দেখছিল সে সব। আর, ভাবছিল—দুষ্ট ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে প্রাণ দিয়েছে বলেই বোধ হয় দেশের লোকের এমন ভালবাসা পেয়েছে যতীন দাস।

চৌরঙ্গী রোডের কাছে এসে, হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন নরেন বৈরাগী।

'এখানে দাঁড়ালেন কেন? দেহ নিয়ে ওরা যে এগিয়ে গেল মামা!' মাতঙ্গ ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

নরেন বললেন—'এই খানটায় একবার মাথা ঠেকিয়ে যা মাতঙ্গ।

'কেন? এখানে প্রণাম করবো কেন?'

'তোর যে কাল বিপ্লবের বোধন হবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। আজ থেকেই জপা শুরু হোক সেই বোধনের মন্ত্রের। জানিস, ১৯২৪ শের জানুয়ারীতে এক তরুণ বাঙ্গালীর বাচ্চা চৌরঙ্গীর এই প্রকাশ্য রাজপথে, আর্নেষ্ট ডে নামে এক ইংরেজকে গুলি করে হত্যা করেছিল ঠিক এইখানটায়। ধরা পড়ার পর আদালতে বুক চেতিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল সে। বলেছিল, আমার ভুল হয়েছে। আমি শয়তান পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মারলাম অন্য একজনকে। এই ভুলের জন্যে আমি দুঃখিত।

'কি নাম ছিল তাঁর, মামা?'

'গোপীনাথ সাহা।'

পরদিন প্রত্যূষে, বিরাট শোভাযাত্রা বের হল শহীদ যতীনের দেহ নিয়ে। পিতা বঙ্কিমবিহারী শ্মশানে যেতে রাজী হলেন না। বললেন—আমার খেঁদু (যতীনের ডাক নাম) আমার মনে চিরজীবি হয়ে থাক, এই আমি চাই। তার মৃতু মলিন মুখখানি আমি দেখতে চাই

না।' তবে তিনি একটি কাগজে চার লাইন লিখে, সেটা তুলে দিয়েছিলেন হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের হাতে শ্মশানে যাঁরা সমবেত হবেন—তাঁদের সাম্নে পাঠ করার জন্যে।

দুপুর দুটো বাজার আগেই শবযাত্রা রাসবিহারি অ্যাভিনিউতে গিয়ে পৌঁছলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শবযাত্রা যেমন বিশাল জনসমুদ্র সৃষ্টি করেছিল, আজকের এই মিছিল তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও স্বীকার করা হয়েছে যে, অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ লোক সামিল হয়েছিলেন যতীনের অন্তিম যাত্রায়।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান কয়েক শো শৃঙ্খলাপরায়ণ স্বেচ্ছা-সেবক। তাদের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্ল শবদেহ শশ্মানের দিকে। শোভাযাত্রার একেবারে সামনে সম্মিলিত কণ্ঠে গান শোনা যাচ্ছিল—'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা।' পথ চলতে চলতে মাতঙ্গের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বৈরাগী ফিস ফিস করলেন—শুনতে পাচ্ছিস গানের কথাগুলো।

'হ্যাঁ, মামা।'

'শিরায় শিরায় আগুনের জ্বালা অনুভব করছিস নে?

'বুকের ভেতরটায় কেমন যেন টন টন করছে।'

'করছে?' নরেন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'করছে তো? ব্যাস আর চিন্তা নেই। বোধন মন্ত্র পৌঁছে গেছে তোর ছোট্ট কচি বুক খানাতে। এইবার বাকী কেবল—প্রার্থনা। চল, আমরা শ্মশানের পাশটায় আগে থেকে গিয়ে দাঁড়াই। দেশবন্ধুকে যেখানে দাহ করেছিল, তার পাশেই, আদিগঙ্গার ধারটায় যতীনের দেহটাকে জ্বালাবে ওরা, শুনেছি। চল, চল আমরা ঐ দিকটাই যাই। তোকে যে আজ

প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে শক্তি ভিক্ষা করতে হবে মহাশক্তিমান ঐ যতীনের আত্মার কাছে। তবে তো হবে তোর বিপ্লবের উদ্বোধন।'

শ্মশানে আগে থেকেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। যতীনের দেহ নিয়ে শ্মশানভূমিতে প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার নতুন করে ঢেকে দেওয়া হল তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ফুলে আর ফুলের মালায়। চতুর্দিকে উঠল শঙ্খরোল ও বিউগল্ ধ্বনি। সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন শবাধারের দিকে। নতজানু হয়ে বসলেন তার সামনে। তারপর শবাধার থেকে ধূলি নিয়ে লেপন করলেন নিজের কপালে এবং শিরে। দধিচীর অস্থিবর্গের অসুরবিধ্বংসী শক্তিটুকু বুঝি ভিক্ষা করে নিলেন এমনি ভাবেই— ভারতের আর এক সর্বত্যাগী সহস্রাংশু জননায়ক ?

ওদিকে চন্দন কাঠের চিতা ততক্ষণে প্রস্তুত।

ধীরে, অতি ধীরে যতীনের কঙ্কালসার দেহটিকে তোলা হল চিতার ওপরে।

হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে, তাড়াতাড়ি বুক পকেট থেকে বের করে আনলেন যতীন জনকের লেখা বাণীটা। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে তিনি পাঠ করলেন—'ওঁ নারায়ণ! যে বিশ্বাসঘাতকতায় মগ্ন হয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছিল, তারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি আমার আদরের পুত্রকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অশ্রুজলে ভিজিয়ে আমার খেঁদুকে (যতীনের ডাক নাম) তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম। তার এই আত্মবিনাশের মধ্যদিয়ে সারা ভারতের যুবশক্তি জেগে উঠুক, এই আমার আজকের একমাত্র প্রার্থনা।' চারিদিকে অখণ্ড স্তব্ধতা। নয়নে নয়নে অশ্রুর অর্ঘ্য টল টল করছে। চকিতে চিতার পাশে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলেন নরেন বৈরাগী।

চিতায় অগ্নিসংযোগের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। পাটকাঠির গোছায় আগুন জ্বালানোও হয়ে গেছে। আর, এ দিকে চিতার পাশে নিমীলিত নেত্রে প্রার্থনারত মাতঙ্গ, যেন এক প্রস্তর-মূর্তি। চিতার এত কাছে বসেছে ও যে, চিতায় আগুন দিলে ওর গায়েও আগুনের হল্কা এসে লাগবে নিশ্চয়।

ছুটে গিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে এলেন নরেন বৈরাগী।

মুখের কাছে চোখ নিয়ে অবাক হলেন তিনি।

যাকে কখনও চোখেও দেখেনি এর আগে, তারই জন্যে দুই আঁখি জলে ভেসে যাচ্ছে মাতঙ্গর!

॥ নয় ॥

'আপনার পৈতে নেই তিনকড়িদা? আপনি তো বামুন!' খালি গায়ে যেদিন প্রথম দেখল তিনকড়ি গাঙ্গুলীকে, সেদিনই মাতঙ্গ প্রশ্ন করে বসল।

'না, ভাই, পৈতে ছেড়েছি বেশ কিছুদিন। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আন্দোলন শুরু করার পরেই, আমি পৈতে খুলে ফেলেছি। এমন কি হরিজনদের সঙ্গে এক থালায় ভাতও খেয়েছি।'

'তবে, আমিও পৈতে রাখবো না আমার গায়ে। মাতঙ্গ ঝাঁ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, এই কথাই বসে ভাবছিলেন তিনকড়ি গাঙ্গুলী। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলের কাছেই তিনকড়িদা বলে পরিচিত যিনি।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পেছনে একতারা হাতে বৈরাগী।

ঢুকেই ঘরের বাইরের দিক্‌কার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি। তিনকড়ি একটু আশ্চর্য হলেন। শুধালেন—'ব্যাপার কি, বৈরাগী?' নরেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন—'যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই হল। তোমার 'তরুণ সংঘে'র ওপর পুলিশের নজর তো পড়েছেই, এবার চাঁপাতলার 'শক্তি সেবক সংঘে'র দিকেও দৃষ্টি পড়লো মনে হচ্ছে। তুমি এখন কিছুদিন ওখানে যাওয়া বন্ধ করো তিনকড়িদা। তোমাকে পুলিশ এখন আর বিশ্বাস করতেই পারছে না।'

বিপিন বললেন—'এখন আমাদের হাতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র এসে গেছে, তাই যথেষ্ট হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে বৈকি।'

গিরীন জিজ্ঞেসা করলেন—'সম্প্রতি যে ছয়টা পিস্তল এসেছে চন্দননগর থেকে সেগুলো কোথায় রাখা হয়েছে?'

তিনকড়ি নিম্নস্বরে বললেম—'কসবায়। আমার দাদার কাছে।'

বিপিন সন্দেহ প্রকাশ করলেন—ওটা মনে হয় খুব নিরাপদ জায়গা নয়। তাহলে রাখা যায় কোথায়? চারিদিকে পুলিশ ক্রমেই বেশ সজাগ হয়ে উঠছে। যতীনের মৃত্যুর পরে দুই বছর কেটে গেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা বিপ্লবীষড়যন্ত্র দানা বেঁধে যেমন উঠছে, তেমনি ধরাও পড়ে যাচ্ছে অনেক জায়গায়। ফলে পুলিশের রোষ এখন আক্রোশে পরিণত।

সবাই যখন গভীরভাবে চিন্তা করছেন—পিস্তল লুকোবার স্থানের কথা, বৈরাগী হঠাৎ বললেন—'প্রস্তাব আমি একটা দিতে পারি, কিন্তু সে প্রস্তাবে তোমরা রাজী হবে বলে তো মনে হয় না।'

'কি প্রস্তাব বলুন!' বিপিন আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

'মাতঙ্গ ছেলেটাকে এ দায়িত্ব দিলে কেমন হয়। চার বছর হল বাড়ী ছেড়ে এসেছে। দু' বছর আগে, যতীন দাসের মৃতদেহ স্পর্শ করে—দেশের কাজে শপথ নিয়েছে। আমার চোখে এমন তেজী গুণী ছেলে তো আর দ্বিতীয় পড়ে নি।'

গিরীন জানতে চাইলেন—'ছেলেটা বর্তমানে কোথায় আছে।'

বৈরাগী জ্ঞাপন করলেন—'মাতঙ্গ সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় প্রথমে ছিল। তারপর ডায়মণ্ডহারবার, আলমবাজার, খড়দহ, বরানগর—সব ঘুরে এসে এখন আবার তাঁর কাছেই আছে।'

বিপিন শুধালেন—'এ ব্যাপারে তিনকড়িদার মত কি? ওর হাতেই তো ছেলে-বাছার ভার।'

তিনকড়ি বললেন—'ছেলেটার অনেক গুণ। রিভলবার পিস্তলে ওর হাত একেবারে পাকা সৈনিকের মত। যে কোন মটর গাড়ী

চালায় দুরন্ত বেগে। আমাদের কর্মীদের এই দুটি জিনিসে পাকা করে তুলতে হলে—এই রকম ছেলের কাছেই ট্রেনিং পাওয়া দরকার। তার ওপর গান বাজনায় ওস্তাদ—'।

তিনকড়ির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বৈরাগী বলে উঠলেন—'ওস্তাদ বলে ওস্তাদ? নিজে গান লেখে, নিজে সুর দেয়, আবার নিজেই সেই গান গায়। শোনো না। তার একটা ছোট্ট কবিতা আমার পকেটেই আছে, আমি পড়ছি। ভাবছি এটা উপেন মুখুজ্জ্যেকে দেবো। যদি কোথাও ছেপে বের করে'—বলেই, পকেটের কাগজখানা মেলে ধরে পড়তে শুরু করলেন—

কোথা ঈশ্বর খুঁজে মরি মোরা
মন শুধু ভরা ভুলে,
আসল পথের ঠিকানা আজিকে
তুমিই দিয়েছ খুলে।
মূর্তি অথবা দেউলে দেবতা
জানি না কোথায় রাজে।
দেবতা আছেন তুমিই বলেছো
প্রতি মানুষের মাঝে।
বিশ্বসভায় জ্ঞানের প্রদীপ
জ্বেলেছো নিজের হাতে
তোমারি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
নিবেদিতা এলো সাথে।
সবার ওপরে মানুষ সত্য
জীবে প্রেম সেরা জেনে
মানুষের মাঝে দেবতা দেখেছো
দিয়েছ আলোক এনে।

'এতো দেখছি বিবেকানন্দকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ঐটুকু বয়সের

ছেলের হাতে এমন কবিতা বেরুলো নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য।' গিরীন বললেন।

তিনকড়ি তাঁর মনের ইচ্ছাটুকু এবার অকপটেই প্রকাশ করলেন —'আমিও ভাবছি, ওকে এবার ওর নিজের গ্রামেই পাঠাবো। এখানে আমরা যেমন এক এক জায়গায় এক একটি সংঘ তৈরি করে তারই আড়ালে আমাদের বিপ্লবের কাজ চালাচ্ছি, যেমন বড়িশার সাবর্ণ পাড়ায় অমিয় মুখার্জি আর সরসুনার শচীমোহন তাদের সংগঠনের ভেতর দিয়ে কাজ চালাচ্ছে, তেমনি এই ছেলেকে দিয়ে শিবরামপুরে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করিয়ে, আমাদের ছেলেদের মটর ড্রাইভিং আর পিস্তল ব্যবহার শেখাবার ব্যবস্থা করবো। গ্রামে— পুলিশের নজরও বেশী পড়বে না। তাছাড়া—'

'তাছাড়া চার বছর হয়ে গেল মাতঙ্গ বাপ-মাকে ছেড়ে চলে এসেছে। এর মধ্যে, প্রথম বছরে একবার মাত্র রাত্তিরে গিয়ে দেখে এসেছে বাড়ীর সবাইকে।' বৈরাগীর হয়ে বলে গেলেন গড় গড় করে তিনকড়িদা 'ইদানিং মাঝে মাঝেই মা-মা করে। মুখ ভার করে বসে থাকে। গাঁয়ে ফিরতে পারলে নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারবে ও।' তিনকড়ি পুনশ্চ বললেন—'এমনি একাগ্রচিত্ত ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। যে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়েছি, আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতায় তা সম্পন্ন করেছে মাতঙ্গ। আপনি কি বলেন বিপিনদা, পাঠিয়ে দেবো ছেলেটাকে গাঁয়ে?'

'মনে হচ্ছে তো পাঠালে ভালই হবে। আমাদের একটা গোপন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠবে ঐ গ্রামে। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে বেহালা থানায়ও একটা কি কাণ্ড করে পালিয়ে এসেছিল। সেই মামলাতে আবার ফাঁসবে না তো?' বিপিন শুধালেন।

'সে তো চার বছর আগেকার ব্যাপার। তখনকার ও. সি. দারোগা, কনস্টেবল সব বদলি হয়ে গেছে কবে। সেবার তো পুলিশের হাতের বন্দুক নিয়ে, তা শূন্যে ছুঁড়ে কেবল ভয় দেখিয়ে পালিয়ে এসেছিল ও।

এতদিন পরে, ও ব্যাপার নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না—মনে হয়।' বৈরাগীর বক্তব্য।

'তবে, তাই করো। কালই ছেলেটাকে একবার নিয়ে 'তরুণ সংঘে'র মূল কেন্দ্রে, ওয়েলিংটনে চলে এসো। ওর ইচ্ছাটাকেও তো একবার বাজিয়ে নেওয়া দরকার। গ্রামে ফেরার ইচ্ছা ওর সত্যিই আছে কি না।'

গিরীন জিজ্ঞাসা করলেন,—'গ্রামে যদি যায়, তবে আমাদের অস্ত্র-শস্ত্রের কিছু ওখানেও লুকিয়ে রাখা যায় না?'

বৈরাগী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'বিশেষ করে এই কারণেই তো আমি ওকে পাঠাতে চাচ্ছি গ্রামে। পুলিশ এখন ভারী সজাগ। কালই যে কশবায় তিনকড়িদার দাদার বাড়ীতে হানা দেবে না, এমন কথা কে বলতে পারে?'

পরের দিন, ওয়েলিংটনে, কালীপদ মুখার্জির বাড়ীর একতলায় লাইব্রেরী ঘরে—তিনকড়িবাবু, বিপিনবাবু, কালীবাবু আর গিরীনবাবুর সামনে মাতঙ্গকে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন বৈরাগী।

ছোটো খাটো চেহারার ছেলেটা। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরেছে, গায়ে সাদা হাফ হাতা শার্ট। পায়ে সাদা কেডস্। সবই পুরণো এবং প্রায় জীর্ণ, কিন্তু পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ করছে কাপড়, শার্ট, জুতো—কেবল ছেলেটার চেষ্টায় এবং যত্নে মনে হয়।

চোখ দুটো যেন কাঁচের মার্ব্বেল। চিক্ চিক্ করছে সেখানে বুদ্ধির দীপ্তি—।

বেশ ভাল করে কিশোরটিকে দেখে নিলেন বিপিন। তারপর শুধালেন—'মা, বাবার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু দেশের কাজ করার শপথ নিয়েছ তুমি যতীন দাসের চিতা স্পর্শ করে শুনলাম, সে শপথের কি হবে?'

'আমাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি দেশের কাজ করিয়ে নিন। আমি তো তাই চাই। তাড়াতাড়ি দেশের কাজ সেরে—বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়বো। বাবা-মার যে কি অবস্থা, তা তো আমি জানি! তাদের দুঃখ দূর করতে হবে না?'

গিরীন ও বিপিন দুজনাই হেসে ফেললেন।—'বাণিজ্য করতে যাবে?' বিপিন জিজ্ঞেসা করলেন, 'কোথায়? সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে!'

'তা জানিনে। তবে গণকঠাকুরের কথা যদি সত্যি হয়, তবে নীল সাগরের পারে তো নিশ্চয়ই।' মাতঙ্গের উত্তর।

বিপিন জিজ্ঞাসু নেত্রে বৈরাগীর দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন—'ও গুরুমুখ সিং-এর কথা বলছে।'

'কোন্ গুরুমুখ? লালা লাজপতের দলের সঙ্গে যাঁর—'

'হ্যাঁ গো, সেই। গুরুমুখের তো বেশ নাম-ডাক জ্যোতিষবিদ্যায়। সে-ই মাতঙ্গকে আমার সামনে বলেছে এই কথা।' বৈরাগী জানালেন।

'কি কথা?' বিপিনের ঔৎসুক্য।

'নীল সমুদ্রের তীরে মাতঙ্গ নাকি নয়তলা প্রাসাদ বানাবে, অনেক চাকর-বাকর, ভ্যান, কার, বাস, লরী ওর থাকবে। কোটিপতি হবে নাকি মাতঙ্গ ব্যবসা করে।'

'গুরুমুখ বলেছেন এইসব কথা?'

'হ্যাঁ! আর সেই থেকে শুরু হয়েছে ওর বাণিজ্যে যাওয়ার ঝোঁক। আমাদের অবিনাশ মাষ্টারের কাছে ও নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে, চাঁদ সওদাগর আর শ্রীমন্ত সওদাগরের মত হাজার হাজার টাকা বাণিজ্যেতে আয় করে ও ওর বাবা-মার অভাব অনটন ঘুচোবে।'

'এতো খুব ভাল প্রতিজ্ঞা!' বিপিন বললেন, 'কজন ছেলে বাবা-মার দুঃখ ঘুচোতে এমন প্রতিজ্ঞা নিতে পারে বলুন?'

প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে তিনকড়ি সুর মেলালেন এবার বিপিনের সঙ্গে—'বারবারই লক্ষ্য করছি, যা বলবে ও, তা করবেই। ও যখন বলেছে—

বাণিজ্য করে আয় করবে হাজার হাজার টাকা, তা একদিন ও করবেই, আপনারা দেখবেন।'

হঠাৎ এই সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো মাতঙ্গ। বৈরাগীর হাত থেকে একতারাটা নিয়ে বাজাতে বাজাতে বলল—'কেন, আমার প্রাণের কথা তো রবি ঠাকুরের গানের মধ্যেও আছে!' বলেই মিষ্টি কণ্ঠে গাইতে শুরু করলো সে—'বাণিজ্যেতে যাবোই আমি যাবোই, লক্ষ্মীরে হারাই যদি অলক্ষ্মীরে পাবোই।'

ঘর শুদ্ধ সবাই হতচকিত ছেলেটার কাণ্ড দেখে। গান শেষ হলে, কালীপদই প্রথম কথা কইলেন—'খুব সুন্দর গাইতে পারো তো তুমি! কার কাছে শিখলে?'

'শুনে শুনে।'

বিপিন হাসতে হাসতে বললেন—'বেশ, একমাসের মধ্যে তোমাকে শিবরামপুরে নিশ্চয়ই পাঠানো হবে, যদি তুমি আর একখানা রবি ঠাকুরের ভাল গান আমাদের শুনোতে পারো এখন।'

বিপিনের কথা শেষ হতে না হতেই, গানের মুড়ো-ন্যাজা ছেড়ে দিয়ে দুম করে মাঝখানটা ধরে বসলো ছেলেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য এক অনুভূতিতে কাঁটা দিয়ে উঠল শ্রোতাদের শরীর।

মাতঙ্গ তখন গেয়েই চলেছে—

কিসেরই বা সুখ, কদিনের প্রাণ!
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

রাত্রে পাশাপাশি খাটিয়ায় শুয়ে কথা হচ্ছিল।

নিজের সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে এসে এক অদ্ভুত মায়াতে জড়িয়ে গেছেন নরেন বৈরাগী। মাতঙ্গের মায়ায়।

সেই মাতঙ্গই এবার গাঁয়ে ফিরে যাবে এক মাসের মধ্যে, তখন তো আর যখন খুশি দেখতে পাবেন না ছেলেটাকে। তাই, বড় অস্বস্তি

অনুভব করছিলেন বৈরাগী মনের সেখানটায়, যেখানটায় মানুষ মাত্রই তার প্রিয়তম বস্তুকে প্রতিষ্ঠা করে, নিশ্চিত হৃদয়ে তারই চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখে আনন্দ পায়।

ওদিকে, অনেকদিন পরে, প্রাণে আজ নতুন জোয়ারের জল ঢুকছে যেন মাতঙ্গের। আবার বাড়ী যাবে সে। বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই-এর মধ্যে দিন কাটাতে পারবে। গ্রামে একটা ক্লাব তৈরি করার হুকুম হয়েছে। এরই মধ্যে ক্লাবের নামও ঠিক করে ফেলেছে একটা। মাতঙ্গ প্রশ্ন করলো—'ক্লাবের নামটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো মামা ?'

'কি নাম যেন বললি ?'

'আরতি মন্দির।'

'বাঃ, খাসা নামকরণ হয়েছে।' বৈরাগী বললেন, 'সি. আই. ডি.'র দল ভাববে—পূজো-আরতী হয় বোধহয় ঐ ক্লাবে। তোর তো বেশ বুদ্ধি আছে মাতঙ্গ !

'এই একমাসের মধ্যে আপনি আমায় আরও কতকগুলো ভাল গান শিখিয়ে দেবেন কিন্তু।'

'দেবো।'

বেশ খানিকক্ষণ দুজনের মুখেই কোন কথা নেই। খাটিয়ায় শুয়ে দুজনেই হাত পা নাড়ছে কেবল। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করলেন নরেনই। শুধালেন, 'যখন মস্ত সওদাগর হবি, তখন আমাকে ভুলে যাবি নে তো ? যদি ইংরেজ আমায় ধরে ফাঁসিও দিয়ে দেয়, তবু—সেই সওদাগরের জীবনে আজকের এই জেলখাটা স্বদেশী-করা লোকটাকে মনে রাখিস, আর পারিস তো মাঝে মধ্যে আমার লেখা দুই একখানা গান গাস—তাতেই তোর এই বৈরাগী মামার আত্মার বুক ভরে উঠবে।'

কাঁদো কাঁদো হয়ে মাতঙ্গ বলে উঠলো, 'আপনাকে ফাঁসি দেবে ঐ ইংরেজরা ? আপনার পেছনে বিপিনদা, কালীদা, গিরীনদা, তিন-কড়িদা সব আছেন না ? আপনাকে যদি ইংরেজ ধরে, তবে ওঁরাই

ছাড়িয়ে আনবেন আপনাকে। যেমন প্রত্যেকবার করেছেন। আপনিই তো বলেন, ওঁরা চেষ্টা করে বাইরে বের করে নিয়ে আসেন বলেই না! না হলে সারাজীবন জেলে পচেই মরতে হত আপনাকে।'

'না রে। এবার লাহোরে যাচ্ছি এমন একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে, ধরা পড়লে, কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে ফাঁসির হাত থেকে।

শুনে গুম্ হয়ে গেল ছেলেটা। অনেকক্ষণ মুখ দিয়ে রাটি বেরুলো না তার। ডাকে বটে মামা বলে। কিন্তু পিতার মমতা নিয়ে যে এই দীর্ঘ চার বছর নরেন তাকে বুকের কাছে রেখেছেন, তা আর কেউ না বুঝুক, সে তো জানে। সেই পিতৃতুল্য মানুষটা ফাঁসির কাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন অবিচলিত চিত্তে। কারণ? হুকুম এসেছে! বিপ্লবের কাজে নাকি কোন প্রশ্নের স্থান নেই। নেতা যদি হুকুম করে, তামিল তা করতেই হবে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো মাতঙ্গ—'আপনার বাবা মা তো কাঁদবেন! তাঁদের কথা তো নিশ্চয় মনে হয় আপনার।'

'আমার বাবা মস্ত লোক রে! রায় বাহাদুর! আমি তাঁর অযোগ্য পুত্র। ছেলের জন্যে প্রথম দিকে একটু কান্নাকাটি দৌড়াদৌড়ি করে-ছিলেন। এখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আমিও বাবার ধারে কাছে যাইনে আর। পাছে ইংরেজ তাঁর কোন ক্ষতি করে।'

'আমার বাবা-মাকে কিন্তু আমি ছাড়াবো না, মামা। আগে নয়তলা বাড়ী বানাবো সেই নীল সাগরের পাড়ে, তারপর, শিবরামপুরের ঐ ভাঙ্গাচোরা ঘর থেকে তাঁদের নিয়ে গিয়ে—প্রতিষ্ঠা করবো সেই বিরাট অট্টালিকায়। তারপর, যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন, আমি তাঁদের সেবা করবো এই দুই হাত দিয়ে। আমি হবো নতুন যুগের নতুন শ্রীমন্ত সওদাগর।'

নিজের খাটিয়া থেকে উঠে এসে বৈরাগী মাথায় হাত রাখলেন মাতঙ্গের। স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বললেন—'তাই করিস দাদাভাই, তুই তাই করিস। ঈশ্বর তোর ইচ্ছা পূর্ণ করুন। তোর কথা শুনে প্রাণটা

আমার ভরে গেল আজ। কত ভাগ্য করলে তবে তোর মত সন্তানের পিতামাতা হওয়া যায় এই স্বার্থসর্ব্বস্ব পৃথিবীতে।

কিন্তু কথা ভালোভাবে শেষ হতেও পারলো না। বাইরের দরজায় খট্‌খট্ আওয়াজ। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন বৈরাগী। মাতঙ্গকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন—'এত রাতে কে ডাকতে পারে? পুলিশ এলো নাতো? বাইরে থেকে কে যেন ডাকলো—'বৈরাগীদা, শিগগির দরজা খোলো।' আগন্তুকের মুখে নিজের নাম শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে, দরজা খুলে দিলেন নরেন, ব্যস্তত্রস্ত এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কসবায় গিয়ে তোমার দাদার বাড়ী থেকে পিস্তলগুলো নিয়ে সোজা শিবরামপুরে চলে যাবে। তিনকড়িদাকে একটু আগে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। মাতঙ্গ থাকবে শিবরামপুরে। 'সেকি? তিনকড়িদা পুলিশের হাতে?' অবাক হয়ে গেছেন নরেন ঘটনার আকস্মিকতায়। হ্যাঁ। বিপিনদা তাই বলে পাঠিয়েছেন, অন্ততঃ একমাস আপনিও কলকাতায় থাকবেন না, থাকবেন ধলভূমে, একমাস পরে, সময়মত ডেকে নিয়ে লাহোরে পাঠাবেন বিপিনদা।' বলেই যেমন ধড়মড় করে এসেছিল তেমনি ধড়মড় করেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

॥ দশ ॥

মোসিমপুরের মোড়ে বাসে চাপবার আগে হঠাৎ মাতঙ্গ আবদার ধরে বসলো, 'আমায় কিছু চকোলেট কিনে দাও, মামা। আমি বাবা-মা ভাই-বোন সবাইকে দেবো। এতদিন পরে ঘরে ফিরছি।'

একগাল স্নেহের হাসি হেসে বৈরাগী বললেন, নিশ্চয় দেবো দাদা-ভাই।' দৌড়ে ট্রামরাস্তা পার হয়ে, ওদিকের ফুটপাথের দোকান থেকে দুই টাকার চকোলেট কিনে এনে, আবার শুধালেন—'আর কি ইচ্ছে হচ্ছে দাদাভাই বল্, মন খুলে বল্। মা-বাবা—ওদের কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে হয় না?' 'খুব হয়। কিন্তু দেবো কোথা থেকে? টাকা কই?'

নিজের বুকে ডান হাতের চেটো ঠেকিয়ে নরেন বললেন—'আমি দেবো দাদাভাই। বৈরাগীতো। তাই গান শোনার ভক্ত কিছু জুটে গেছে কপালে। তারা মাসে মাসে নিজে থেকেই এসে পয়সাকড়ি দিয়ে যায়। তাই থেকেই আমি তোকে টাকা দেবো। এখন বল, কি তোর প্রাণের ইচ্ছে?'

একটু কিন্তু কিন্তু করেও মাতঙ্গ শেষ অবধি চেপে রাখতে পারলো না মনের বাসনাটা। বলল, তার ভারী ইচ্ছে বাবাকে একটা ধুতী আর মাকে একটা লাল-পেড়ে শাড়ী কিনে দেয়।

বৈরাগী আনন্দে হাতের ওপর হাত ঠুকে বলে উঠলেন, 'বাঃ এতো

খুব ভাল ইচ্ছে রে। চল তোকে নিয়ে বেহালা বাজারে নামবো।' সেখানেই পছন্দমত কাপড় কেনা যাবে এখন।

কী খুশি আজ মাতঙ্গ! বাবা-মাকে কাপড় দিতে পারবে! জীবনে প্রথম বাবা-মাকে কিছু দেবে সে। কেমনভাবে দেবে? সঙ্গে ছ'ছটি রিভলভার। আগে, বৈরাগীমামার সাহায্যে সেগুলোকে বুড়ো-শিবতলার প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের গোড়ার কাছে মাটিতে পুঁতে রাখবে চটে মুড়িয়ে। যেমন রেখেছিল নরেনের দেওয়া প্রথম রিভলভারটা। তারপর, বাবা-মার চরণে দুইখানি কাপড় রেখে প্রণাম করে বলবে— এই যে দেওয়া শুরু করলাম আজ, শেষ হবে সেই নীল সমুদ্রের ধারেকার নয়তলা বাড়ীতে গিয়ে। নয়তলা বাড়ীটা তোমাদের চরণে যেদিন নৈবেদ্য দিতে পারবো, সেদিনই হবে নতুন যুগের এই নতুন শ্রীমন্তের জীবনে ব্রতের শেষ।

শিবরামপুরে প্রবেশের পরে, বুড়ো শিবতলায় প্রণাম করার নাম করে গিয়ে, সবার আগে অস্ত্রগুলি মাটিতে পোঁতার কাজ সম্পন্ন হলে ও অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে, বৈরাগীর হাত ধরে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল মাতঙ্গ গৃহের দিকে। ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইছে না তার। মা-বাবা ছাড়া হয়ে দূরে পড়েছিল এতদিন। একটা চিঠি লিখবে বাড়ীতে—সে অনুমতিও দেন নি তাকে বিপ্লবের নেতারা। পাছে পুলিশ তার ঠিকানা জানতে পারে, এই ভয়ে। মার স্নেহকোমল প্রশান্ত মুখখানি যতবারই ভেসে উঠছিল তার মনে, ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তার মাতৃবিরহকাতর কিশোর হৃদয় ততবারই—জননীকে চাক্ষুষ দর্শনের দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায়। বৈরাগীর দেওয়া সাইড ব্যাগটা ঝুলছিল মাতঙ্গের বাঁ কাঁধে। তারই মধ্যে আছে বাবা-মার জন্যে আনা ধূতি-শাড়ী, আর ভাই-বোনদের চকোলেট।

কিছুদূর যেতেই দেখা হয়ে গেল আনন্দের সঙ্গে। আনন্দলাল—

মাতঙ্গলালের বড়দা। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো দাদাকে দাদাও পুলকাতিশয্যে ওর মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরলো।

'জানিস বড়দা, তোর আর ছোটদার জন্যে আমি চকোলেট এনেছি অনেক। ছু' টাকার।'

'চল, বাড়ী চল। ভাইবোন সকলে ভাগ করে খাওয়া যাবে। ভারী মজা হবে।' আনন্দ বলল।

'আর বাবা-মার জন্যে ধুতি আর শাড়ী এনেছি। ছ্যাখ না, এই ছ্যাখ। তাড়াতাড়ি ঝুলির মধ্যে থেকে কাপড় বের করে দেখালো মাতঙ্গ তার জ্যেষ্ঠকে। তারপর আবার বলল—'মা যখন সকালবেলা স্নান সেরে লাল-পাড় কাপড় পরে পূজো করতে বসে, তখন আমি চোখ আর ফিরোতে পারি না মার মুখের ওপর থেকে। কি সুন্দর যে দেখায় তখন মাকে। তাইতো, তাইতো আমি নিজে বেছে কিনে এনেছি এই লাল-পাড় শাড়ীটা!'

আনন্দলাল নীরবেই পথ চলতে লাগলো কনিষ্ঠের কাঁধে হাত রেখে।

বেলা পড়ে আসছে। শিবরামপুরের হালদার বাড়ীর সামনের দিকের খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরখানি দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়েছে।

পেছন থেকে নরেন বৈরাগী বললেন, 'ব্যস, এসেতো গেলে বাড়ীতে, এইবার আমি পিছু হটি! আমাকে যে আবার যেতে হবে—ধলভূমগড়ে বঙ্কিমের কাছে, হুকুম হয়েছে—মনে নেই?'

আনন্দলাল পেছনে এসে বৈরাগীর পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করে, অদ্ভুৎ এক স্বরে অনুরোধ জানালো—'আজকে তুমি যেয়ো না মামা। কাল যেয়ো।'

কণ্ঠ শুনে, অনেক অভিজ্ঞতায় পাকা কান অবাক হল একটু। অগ্রজ অনুজকে ফিরে পেল এতদিন পরে—সে উচ্ছ্বাসের সুর কোথায়?

অধীর মাতঙ্গ দাদার হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ীর দিকে যেতে যেতে বলল—'কই, বললি না যে বড়দা, মায়ের শাড়ী তোর পছন্দ হয়েছে, কি না!'

'খুব পছন্দ হয়েছে, ভাই—'

মাতঙ্গ দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শুরু করলো—'মামাবাবু টাকা দিয়েছেন, সেই টাকা দিয়ে কিনে এনেছি বাবা-মা'র কাপড়। নইলে কোথায় পাবো আমি টাকা? তবে হ্যাঁ, মামাবাবুকে আমি বলে দিয়েছি, তাঁর এ টাকা আমি নিশ্চয়ই শোধ দিয়ে দেবো বাণিজ্য করে.........'

মাতঙ্গের কথা শেষ হতে দিল না আনন্দ। হঠাৎ সে বলে উঠল—তুই কবে বাণিজ্যে যাবি, মাতু? মার যে কত ইচ্ছা......'

উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে বলে উঠল—'মার ইচ্ছা পূর্ণ করার আর দেরি নেই বড়দা। আর বড় জোর দুটো বছর। এই দুই বছরের মধ্যে শয়তান ইংরেজদের তাড়াবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে—বলেছেন মামাবাবু। তারপরই—বেরিয়ে পড়বো বাণিজ্যে।' এই পর্যন্ত বলে, একটু থেমে, কি যেন ভেবে নিল একবার। তারপরে, চলতে চলতেই দাদার কোমরটা বাঁহাতে জড়িয়ে নিয়ে সে প্রশ্ন করলো পুনর্ব্বার—'আচ্ছা, বড়দা, বাবাকে যে বলে গিয়েছিলাম, রোজ আমার লক্ষ্মীর কৌটায় দুটো করে পয়সা ফেলতে, সেটা ভুলে যায়নি তো? চার বছরে অনেক টাকা জমে গিয়েছে, নারে বড়দা?'

বাড়ীতে ঢুকতেই তিন বোন ও ছোটদা সুশান্তলাল—এসে হাজির। মাতঙ্গ ছুটে চলে গেল মার ঠাকুরঘরে। জিজ্ঞাসা করলো 'কিরে ছোটদা, মা বাড়ীতে নেই। বেরিয়েছে বুঝি কোথাও?'

অনেক ঝড়ঝাপটা-সওয়া বৈরাগীর মন ক্রমেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে মনে হল। কপালে ফুটে উঠল তাঁর চিন্তার রেখা।

মাতঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল সুশান্তলাল, তাকে থামিয়ে দিয়ে আনন্দলাল জননীর আরাধ্য গোপাল মূর্তির আসনের নীচ থেকে একটা কাগজ বের করে তুলে দিল কনিষ্ঠের হাতে।

'এটা কি?' মাতঙ্গ শুধালো।

'মা'র চিঠি ; আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে। পাঠাতে পারি নি, তোর ঠিকানা তো আমার জানা ছিল না। আনন্দ জানালো।

'কি লিখেছে এই চিঠিতে ? মার চিঠি দিচ্ছ কেন ? মা কোথায় ?'

'পড়েই দেখ না আগে।'

কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করলো মাতঙ্গ—'আমার পরম আদরের ধন মাতু ! তোর বাবা তোর জন্যে ভেবে ভেবে, নানা রোগে ভুগে ভুগে, আজ তিন মাস হল চোখ বুঁজেছেন। তোকে একবার দেখার তাঁর কত ইচ্ছে ছিল ! তুই বলেছিলি বাণিজ্যে যাবি, বাপ-মায়ের দুঃখু ঘুচাবি। কই, আর তো এলি না বাবা ! এবার বোধ হয় আমার পালা। কবরেজ বলছে—হার্টের ব্যামো, আর বেশীদিন বোধ হয় বাঁচবো নারে।

'একবার তুই ফিরে আয়, বাবা। চিরদিনের মত চোখ বুজবার আগে, এই শোকে-পোড়া চোখে তোকে একবার দেখে যাই। সংসারের অভাব-অনটন আর যে সইতে পারি না। কবে তুই হাজার হাজার টাকা আয় করবি।

'এ সংসার আবার লক্ষ্মীর ঘর হবে—আমি যে কেবল সেই স্বপ্নই দেখি রাতদিন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী কি মিথ্যে হবে ?'

এই পর্য্যন্ত পড়া শেষ হতেই আর্তনাদে ফেটে পড়লো মাতঙ্গের কণ্ঠস্বর—'এ সব কিচ্ছু পড়তে চাই নে আমি, আমি কেবল জানতে চাই মা কোথায় ?'

আনন্দ এগিয়ে এসে, শান্তভাবে একটা হাত তার পিঠে রেখে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল—'মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, ভাই।'

'মা নেই !' উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকালো স্তব্ধ-হয়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা সব ক'টা ভাইবোনের দিকে। একটা চোখও শুকনো নেই সেখানে। ছোটদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আবার চিৎকার করে উঠল মাতঙ্গ—'এ শাড়ী, এ কাপড় আমি কাকে দেবো আমায় বলে দাও।'

এবার বৈরাগী এগিয়ে এলেন মাতঙ্গের দিকে। মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোলেন কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ ওঁর বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদলো প্রাণদাময়ীর পরম আদরের ধন।

শেষে গুরু গম্ভীর স্বরে বৈরাগী বললেন—'বিপ্লবীর বুক ফাটবে, কিন্তু চোখে জল আসতে দেবে না, দাদা ভাই। যতীন দাসের শবাধারের স্পর্শ আছে যার অঙ্গে, তার চোখে জল এলে চলবে কেন?'

বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে চাইল এবার মাতঙ্গ বৈরাগীর অশ্রুতে ভেজা তবু জ্বলন্ত দুই চোখের দিকে! তারপর ধীরে বলল —'আর কাঁদবো না মামাবাবু।'

'হ্যাঁ, কাঁদবিনে। বিপ্লবীর পথ কান্নার পথ নয়। লড়াই-এর পথ। তোকে দেশের কাজ করতে হবে, মায়ের কাছে দেওয়া কথা রক্ষা করে সত্যিই একদিন বাণিজ্যে যেতে হবে—'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যতখানি সম্ভব দৃঢ়তা ফুটোবার চেষ্টা করে মাতঙ্গ শুধালো—'পারবো আমি, মামা?'

'নিশ্চয় পারবি। তোর মাথায় যে রয়েছে তোর পুণ্যবতী মায়ের আশীর্বাদ।'

* * * *

কেই বা আসলে মাতঙ্গর জীবন-সংগিনী বাণী হালদার। লরোটোয় পড়া অনর্গল ইংরেজী বলা, বসনে-ভূষণে অত্যাধুনিকা এক যুবতী, নন্‌ম্যাট্রিক একটি গ্রাম্য যুবাকে বেছে নিলেন কেন তাঁর জীবন-দেবতারূপে? কোন্ গুণ তিনি খুঁজে পেলেন এই কারালাঞ্ছিত, সংসারের সব সুখে বঞ্চিত, অবিখ্যাত যুবক মাতঙ্গের মধ্যে—যার

কাছে ম্লান হয়ে গেল বাণীর অন্যান্য ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার পাণিপ্রার্থীর দল? দিল্লীর অ্যাডভকেটের একমাত্র সন্তান বাণী, হাসতে হাসতে এসে হাত ধরলেন মাতঙ্গেরই, অন্য কারও নয়। বললেন—

রুক্ষদিনের দুঃখ পাইতো পাবো—
চাই নে শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো।
পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙ্গে যদি, ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছো আমি আছি॥

তারপর শুরু হল জীবন-সংগ্রাম।

স্বজন বান্ধবহীন, সহায় সম্বলহীন; স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত দুই যুবক-যুবতীর বিদেশে বাণিজ্য। অনাহার, অনিদ্রা, অসম্মান আর অশান্তি হল নিত্য সহচর। তবু লড়াই থামাতে জানে না এরা। শেষ পর্যন্ত সাফল্য এসেছে জীবনে। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পার হয়ে, আজ শিবরামপুরের সেই ছোট্ট ছেলেটি সত্যিই নীল সাগরের তীরে অভ্রভেদী নয়তলা বাড়ীর মালিক হয়েছে। কত কার, ভ্যান, ট্রাক, বাস স্কুটার তার চারধারে থৈ থৈ করছে।

মাতঙ্গ এখন কয়েক কোটী টাকার সম্পত্তির অধিকারী। শিখ জ্যোতিষী গুরমুখ সিং-এর ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয় নি। প্রাণদাময়ীর প্রাণের ধনকে একডাকেই চিনতে পারে আজ অনেকে কিন্তু, মুস্কিল হচ্ছে অনেক নামকেই বিকৃত করতে হয়েছে এই রচনায় কেবলমাত্র মাতঙ্গের মনের কথা চিন্তা করেই। পঁচাত্তর বৎসর বয়েসেও আজও তিনি প্রচার কুণ্ঠ প্রকাশ ভীরু। তাই এবার প্রথম খণ্ডটা পড়িয়ে আগে অনুমতি নেবো শ্রীযুক্ত মাতঙ্গ হালদার আর শ্রীমতী বাণী হালদারের। আজকের এই শান্তিহীন, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীন পৃথিবীতে—এই দুর্লভ দম্পতি আমার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু। ওঁদের অনুমতি পেলে, দ্বিতীয় খণ্ডে নিশ্চয় নামের উল্লেখ করা যাবে তাঁদের।

—(*)—